ইমারত

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়



মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

—তিন টাকা—

দ্বিতীয় সংস্করণ
কার্তিক, ১৩৫৫

মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীসুমথনাথ ঘোষ কর্তৃক
প্রকাশিত এবং পরিচয় প্রেস, ৮বি, দীনবন্ধু লেন, কলিকাতা
হইতে শ্রীকুন্দভূষণ ভাদুড়ী কর্তৃক মুদ্রিত।

খ্যাতিমান কথাশিল্পী—বাউল মানুষ—

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রীতিভাজনেষু—

বন্ধু—

হঠাৎ পথে একদা তোমাকে চিনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাম। অঞ্জলি দেওয়া হয় নাই সেদিন। আজ সুযোগ পাইয়া ধন্য হইলাম।

মুগ্ধ

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

—এই লেখকের—

কবি
পঞ্চগ্রাম
তামস-তপস্যা
মন্বন্তর
ধাত্রীদেবতা
গণদেবতা
কালিন্দী
জলসাঘর
রাইকমল
চৈতালি ঘূর্ণি
রসকলি
১৩৫০
প্রসাদমালা
প্রতিধ্বনি
স্থলপদ্ম
আগুন
সন্দীপন পাঠশালা
বেদেনী
যাদুকরী
হারানোসুর
ছলনাময়ী
দিল্লীকা লাড্ডু
পাষাণপুরী
নীলকণ্ঠ
চকমকি
বিংশ শতাব্দী
দুই পুরুষ
পথের ডাক
দ্বীপান্তর

ইমারত

শিবপ্রতিষ্ঠা করছেন শ্যামাদাসবাবু। লোকের কাছে পরম বিস্ময়ের কথা। কৃপণ লোক; কার্পণ্যের তপস্যায় তাঁর পিতামাতাও নাকি মুদ্রাত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন। লোকে বলে এক পয়সা মা-বাপ শ্যামাদাসবাবুর। তাঁর টাকাও গল্পের টাকা। গল্পের বস্তু অল্প হয় না—কেউ বলে লাখ—কেউ বলে দু' লাখ—কেউ বলে লোকটা যত বড়—টাকার স্তূপটিও তত বড়। তাঁর সিন্দুকের সর্বশেষ স্তরের যে টাকাগুলি সেগুলি ওজনে ঠিক থাকলেও আকারে ঠিক নাই, উপরের টাকার রাশির ভারের চাপে চেপ্টে বড় হয়ে গিয়েছে এবং চেহারাতেও কালো হয়ে গিয়েছে, ছাতা ধরেছে। অনেকে বলে—সেগুলি অচল; কেন না—সরকার নোটিশ দিয়ে ঘোষণা করেছেন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রথম আমলের টাকা—যেগুলিতে মুকুটহীন রাণীর মূর্তি মুদ্রিত—সেগুলি অচলিত হয়ে গেল। একটি সময়ও তাঁরা দিয়েছিলেন, এই টাকা স্থানীয় রাজকোষে দিয়ে তার পরিবর্তে নতুন টাকা বদল নেবার জন্য। কিন্তু শ্যামাদাসবাবুর স্বভাবই অন্য রকমের. সিন্দুকে যা তিনি রাখেন তা আর বা'র করেন না। লোকে বলে—শ্যামদাসবাবুর ধারণা—বা'র করলেই বাইরের বাতাসে সে উড়ে যাবে। শ্যামদাসের তৃপ্তি—সঞ্চয়ের তৃপ্তি—সেখানে অচল হ'লেও ক্ষতি নাই—যেহেতু না চালাবার প্রশ্নই নাই সেখানে। সেই লোক শিবপ্রতিষ্ঠা করবে এতে লোকের বিস্মিত হবারই কথা।

বিস্ময়ের প্রধান কারণ এবং মূল রসটা আকস্মিকতার মধ্যেই নিহিত থাকে। এবং তার বৈচিত্র্য ও মহার্ঘতা অল্পক্ষণ স্থায়িত্বের মধ্যেই আবদ্ধ-ফ্রেমে ঘেরা ছবির মত। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তারও ব্যতিক্রম হ'ল।

মন্দিরের উপকরণ যখন এল তখন পাকা ইঁট দেখে লোকের মনে হ'ল— তাদের কল্পনাকে এটা ছাড়িয়ে গেল। বললে—ইঁট পাকা হ'লেও, কাদা দিয়ে গাঁথবে।

কয়েকদিন পর দেখা গেল—চূন এসেছে, মজুরে সুরকী ভাঙছে। লোকে থমকে দাঁড়াল। গাঁথনী পাকাই হবে তা হ'লে! ছোটখাটো পাকা মন্দির একটি।

বিস্ময় আবার একদফা উৎপাদিত হ'ল—জনাব সেখ রাজমিস্ত্রীকে দেখে। এ অঞ্চলের সর্বশ্রেষ্ঠ পাকা কারিকর। এবং তার হাতে কাজ কম খরচে হয় না।

মাঝখানে চেরা সিঁথিটি তার ওলংয়ের সুতোয় পাকানো সরু দড়িটির মত সাদা এবং সোজা, বাবরী-কাটা সাদা চুলগুলি পরিপাটি ক'রে আঁচড়ানো কর্ণি দিয়ে মাজা পঙ্কের পলেস্তাতার মত চকচক করছে। ঘাড়ের চুলগুলির প্রান্তভাগ সযত্নে কেটে নিচে থেকে ঘাড়টা কামিয়ে ফেলেছে, গোল থামের মাথায় বেড় দেওয়া কার্নিশের বিটের মত—সবচেয়ে পাতলা কর্ণি দিয়ে দড়ি ধ'রে কাটা হয়েছে যেন। গোঁফ এবং গাল কামিয়ে চিবুকের নিচে নূর দাড়ীটিও ঠিক এমনি সযত্নে কাটা। ধপধপে পরিচ্ছন্ন দাঁতগুলির ফাঁকে কালো মিশির দাগ—পয়েন্টিং করা আলসের মত। চকচকে ছোট একটি হুঁকোতে ইঞ্চি চারেক লম্বা একটি বাঁশের নল লাগিয়ে, ভাল তামাকের মিষ্টি গন্ধে চারিদিকে বেশ একটা নেশার আমেজ ছড়িয়ে জনাব তামাক টানছে আর দীর্ঘ হাতখানির সরু আঙুল দেখিয়ে নির্দেশ দিয়ে কাজ করাচ্চে। গলায় ত্ব'হালি কালো কারে বেড় দিয়ে বাঁধা একটি পাকা সোনার চৌকা তক্তি। গায়ে চেক-কাটা পরিচ্ছন্ন ফতুয়া, কাঁধে বাহারে রঙের ডোরাকাটা, সযত্নে পাট করা একখানি গামছা। পরনে ময়ূরকণ্ঠী রঙের লুঙ্গি। পায়ের চটি জোড়াটা এককালে সৌখীন ছিল—এখন কিন্তু পুরানো হয়েছে।

ইঁটের থাক দেওয়া হচ্ছে। মজুরেরা ইঁটের উপর ইঁট সাজিয়ে থাকবন্দী

করে রাখছে; যাতে ইঁট তুলতে সুবিধে হয়, বরবাদ না যায়, এমন কি দু'খানা ইঁট সরলেই ধরা যায়।

জনাব বলছিল—ই ক'রে রাখ বাপ, হুঁস ক'রে—হুঁস ক'রে রাখ। সুঁ-জু—সমা-ন ক'রে একটির উপর একটি রেখে যা বাপ। গাঁথনী করা ইমারতের নতুন বাহার দিবে। বেটাল হয়ে টলে পড়ে যাবে না।—এই দেখ! সর। দেখে লে।

সে তাকে সরিয়ে নিজেই ইঁটের উপর ইঁট সাজিয়ে রাখতে লাগল—নিপুণ হাতে—অবলীলাক্রমে।—হাঁ। হুঁস আর হিসাব। আর কাম করবার সময় মনে মনে বলিস না—বাবা রে! মন যখন বলবে—বাবারে, তখুন একবার তামুক খেয়ে লিবি। লে টেনে লে একটান—। খুসবইওয়ালা তামাক। কাঁধের গামছাখানি দিয়ে হাত দু'খানি থেকে ইঁটের ধুলো ঝেড়ে নিয়ে কল্কেটি সে মজুরটির হাতে দিলে।

বিস্মিত রামপ্রসাদ জনাবের পিছনের দিকে থমকে দাঁড়িয়েছিল এতক্ষণ। এবার জনাব এ দিকে ফিরতেই প্রশ্ন করলে—তুমি এখানে জনাব? ব্যাপার কি বল তো?

কপালে হাত ঠেকিয়ে অভিবাদন করলে জনাব—সেলাম গো বাবু। শ্যামা-দাস বাবুজীর মন্দিল হবে। আমি গাঁথছি।

—তা তো দেখছি। কিন্তু শ্যামাদাসবাবুকে তুমি মেরে ফেলবে নাকি?

জনাব একটু হাসলে। বললে—আজ্ঞে না, অল্প খরচে সেরে দিব—সে বুলেছি আমি বাবুকে।

—তোমার হাতে অল্প খরচে হবে তো?

জনাব হা-হা ক'রে হেসে উঠল। হঠাৎ হাসি থামিয়ে বলে উঠল—আঃ হায়—হায়—হায় গো। বলি—উ-কি ইঁটা ভাঙচিস গো তু? এ্যাঁ! নোড়ার নতুন—মোটো—মোটো! এ্যাঁ!

সে এগিয়ে গেল লম্বা পা ফেলে।

এদিকে এক জায়গায় জমায়েৎ হয়ে বসে—বেশ যেন মজলিস করার ভঙ্গিতে মজুরনীর দল ছোট হাতুড়ি দিয়ে ইট ভেঙে খোয়া তৈরী করছিল।

বাছাই করা মজুরনী সব জনাবের। জনাবের নিজের মজুরীও বেশী, ওর মজুরনীদের মজুরীও চড়া। পরিচ্ছন্ন কাপড় আঁট ক'রে বেড় দিয়ে সর্বশেষ উদ্বৃত্ত অংশটুকু কোমরে ফেরতা দিয়ে জড়িয়ে পরেছে, হাতে এক হাত ক'রে কাচের চুড়ি, স্বাস্থ্যবতী তরুণী নিয়ে জনাবের মজুরনীর দল। আরও একটা বিশেষত্ব আছে, সাধারণে না জানলেও মজুরনীরা জানে, তরুণী হ'লেও যদি কেউ বেঁটে আর মোটা হয় তবে তাকে তারাই বারণ ক'রে দেয়—তু বুন যাস না। লেবে না। বুড়ো বলে—ঢ্যাপসা মেয়ে কাম করতে পারে না। লড়ে বসতেই উদের ছ মাস। তরুণী মেয়েদের মধ্যে আবার যাদের চোখ ডাগর, চুল বেশী—তারাই থাকে জনাবের পাশে; জনাবের হাতে ইঁট জুগিয়ে দেয়, মসলা ঢেলে দেয় গাঁথনীর উপর, ওলং এগিয়ে দেয়, জলের মগ-পাটা দেয় হাতে হাতে, রাজ মিস্ত্রীর হুঁকো কল্কে তামাক টিকে রাখে সযত্নে, বরাত মত সেজে দেয়। মধ্যে মধ্যে জনাব ভরা দুপুরের রোদের সময় বলে—লাতবউ একটা গায়েন কর না ভাই! বেশ মিহি গলায়। তু গাইবি—আমি আর লাতিন শুনব। হ্যাঁ।

মিহি কাজের সময় মধ্যে মধ্যে কাজ বন্ধ ক'রে ঘাড়টা একটু পিছনের দিকে হেলিয়ে দেখতে দেখতে বলে—দেখ তো ভাই লাতনী লাতবউ তুদের ডাগর চোখে, দেখতো এক লজর। বল দেখিনি কুথা কি খারাপ লাগছে?

অন্য সব মজুরনীরা সব দিদি। বড়দিদি, মেজদিদি থেকে ছোটদিদি পর্য্যন্ত।

আগেকার কালে যারা পাশে থাকত তাদের কেউ ছিল ঠাকুর ঝি, কেউ ছিল ভাবী। দু'-চারজনকে বউ বলেও ডাকত। তাদের দু'জন প্রৌঢ়া এখনও আছে জনাবের দলে। তারা সর্দারনী। দেখাশুনা করে মজুরনীদের কাজ। নিজেরাও করে টুকিটাকি এটা ওটা। এরাই আড়কাটির

মত সংগ্রহ ক'রে আনে নতুন মজুরনী। আনলে জনাব খুসী হয়; সংগ্রহকারিণী প্রৌঢ়া দিনকয়েকের জন্য জনাবের কাছে পুরানো কালের সমাদরের খানিকটা যেন ফিরে পায়।

জনাব এগিয়ে গেল মজুরনীদের খোয়া ভাঙার জায়গায়। নতুন একটি মজুরনী খোয়া ভাঙছে—খোয়াগুলি ঠিক ভাঙা হচ্ছে না, অনভ্যস্ত হাতের হাতুড়ির আঘাতে কতক হচ্ছে বড় বড়, বাকী খানিকটা ভেঙে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে, কতক হচ্ছে নেহাৎ ছোট যা দিয়ে কোন কাজ হবে না।

জনাব তার হাত থেকে হাতুড়ি নিয়ে ভাঙার কৌশলটা দেখিয়ে দিলে —এই দেখ—এই দেখ, চোখ দুটি তো বড় বড়, নজর করে দেখ। বেশী মোটোও হবে না—বিচি-বিচি ছুটুও হবে না; বেশী জোরে হাতুড়ি মারবি না, আবার আস্তে ঠুকুস ঠুকুস ক'রে মারলেও হবে না। এক তালে ঘা; হ্যাঁ—এই দেখ—এই দেখ!

শ্যামাদাসবাবু এসে দাঁড়ালেন। খাটো মানুষটি, গৌরবর্ণ রঙ, পাকা চুল, চঞ্চল প্রকৃতি ছেলের মত অস্থির লোক। বারকয়েক এদিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়ালেন, তারপর এসে দাঁড়ালেন মজুরনীদের খোয়া ভাঙার জায়গায় —জনাবের কাছে। দাঁড়িয়েও তিনি স্থির থাকতে পারেন না—অনবরত দোলেন। হাতের আঙুলগুলি অহরহ সক্রিয়, অঙ্গুষ্ঠের নখ দিয়ে মধ্যমার নখটা অবিরাম খুঁটে চলেছেন। লোকে বলে টাকা বাজিয়ে ঐ অভ্যাসটা হয়েছে তাঁর। শ্যামাদাসবাবু বললেন—জনাব! একে বলে—এই ছুঁড়িগুলোকে লাগালে কেন হে?

জনাব হাসলে, বললে—জোয়ানী বয়েস না হ'লে কাজ হবে কেনে হুজুর? খাটবে কে? তা ছাড়া পাতলা হাত ওদের এখুন—হাল্কা পা—হাল্কা শরীল, হাঁটবে বন বন ক'রে, ভারায় উঠবে খর খর ক'রে।

শ্যামাদাস বললেন—না—না—না, হারামজাদীরা ভারী পাজী। ক্রমাগত

ফ্যাক ফ্যাক ক'রে হাসবে। মজুরগুলো কাজ করবে না, ফষ্টি নষ্টি করবে। ভাগাও—ওগুলোকে তাড়িয়ে দাও।

জনাব বললে—আপুনি যান ইথান থেকে হুজুর। আমি রইলাম—আপনার কাম রইল। বরবাদ হয় আমাকে ফজিয়ৎ করবেন। আমি জবাবদিহি করব।

একটু চুপ ক'রে থেকে শ্যামাদাস বললেন—এই মাঝারী একটি মন্দির হবে। বেশী ছোটও না হয়, বেশী বড়ও না হয়। বুঝেছ তো? আবারও একটু চুপ ক'রে থেকে তিনি বললেন—লোকে বলছে, তুমি লাগলে আর থাম না।

জনাব হাসলে; বললে—ইমারত আপনার, আমার লয়—আমার বাবার লয়। আপুনি যেমন হুকুম করবেন তেমনি হবে। পাঁচ হাত বলেন পাঁচ হাত; দশ হাত বলেন দশ হাত। আবার বুলেন একশো হাত দেড়শো ফুট তাই হবে। একটা হিসাব তো আছে। যেমন ভিত করবেন তেমনি মন্দির হবে। আবার মাঝখানে বুলেন থেমে যাও জনাব, তাই হবে। কর্ণি পাটা নিয়ে চলে যাব বাড়ী।

শ্যামাদাস উত্তর খুঁজে পেলেন না এর। নিরুত্তর হয়ে চঞ্চলভাবেই চলে গেলেন সেখান থেকে।

* * *

মন্দির উঠছে।

লোকে যেতে যেতে দেখে পথে দাঁড়ায় সবিস্ময়ে। মন্দির তো ছোট হবে না!

ভারা বাঁধা হয়েছে, একখানা বাঁশের দৈর্ঘ্য ছাড়িয়েছে—প্রথম বাঁশের মাথায় আবার নতুন বাঁশ বাঁধা হয়েছে, তারও দুটো থাক ছাড়িয়ে তৃতীয় থাকে তক্তা পেতে জনাব কাজ ক'রে যাচ্ছে। পাশে দুটি তরুণী—কাহারদের বউ মতিবালা, আর হাড়িদের মেয়ে দাসী। জনাবের বিপরীত দিকে আর একটা ভারায় দু'জন রাজ কাজ করছে—আব্দুল আর রসিদ।

শ্যামাদাসবাবু নিচে এসে কখন দাঁড়িয়েছেন। লোকের কথাই সত্য। জনাব সহজে থামবে না। এখনও চারখানা দেওয়াল সোজা উঠে যাচ্ছে। কাটান দিয়ে এখনও একখানা ইঁটও গাঁথা হয় নাই। সুতরাং কত উঁচুতে যে মন্দিরের চূড়া গিয়ে ঠেকবে সে বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তার উপর কাজ অগ্রসর হচ্ছে যেন শামুক চলছে। জনাবকে দোষ দেওয়া যায় না, সে কাজ ক'রে যায় ঠিক, কিন্তু ওই যে দুটো রাজমিস্ত্রী ওরা ক্রমাগত বিড়ি খাচ্ছে। বিশেষ ক'রে সবচেয়ে অল্পবয়সীটা। শুধু বিড়ি খাওয়াই নয় —অল্পবয়সী মজুরনীগুলোর সঙ্গে হাসাহাসির আব বিরাম নাই। তিনি ডাকলেন—জনাব!

জনাব নিচে তাকিয়ে বললে—আজ কাটান দিব হুজুর।

—তা বেশ। কিন্তু একে বলে—ঐ ছোকরা রাজ-মিস্ত্রীটাকে কাজ করতে বল।

জনাব ছোকরার দিকে দৃষ্টি ফেরালে। জনাবের মনে আছে আজ ও কোনখান থেকে ইঁট গাঁথতে সুরু করেছে। কত ফুট গেঁথেছে সে-ও সে মাপ না ক'রে একবার নজর দিলেই বুঝতে পারে। তার ভুরু কুঁচকে উঠল। সত্যিই ছোকরার কাজ মোটেই এগোয় নাই।

সে বললে—কি রে? তু কি ভেবেছিস বুলত? মতলব কি রে তুর?

ছোকরা ব্যস্তভাবে কাজ করতে আরম্ভ করলে—কোন উত্তর দিলে না।

জনাব বললে—দেখ, একটি বাত তুকে বুলি শুনে রাখ। এই টাকা বড় খারাপ চিজ। চাঁদি লয় পারা। পারাকে পুড়ায়ে ভসম লিয়ে খা—সি তখুন ওষুদ। কাঁচা খা—গায়ে ফুটে নিকলে যাবে।

একখানা ইঁট হাতে নিয়ে তার উপর কর্ণির ঘা দিতে দিতে আবার বললে—পরের ষোল আনি টাকা, যখুন ষোল আনি কাম ক'রে লিবি, তখুন সি হ'ল পারা ভসম্ (ভস্ম)। তাতে যা খাবি সে দিবে তুকে তাগদ। আর

ফাঁকি দিয়ে লিবি—তো সি টাকা লয়, সি পারা। তাতে যা খাবি—সে হবে বদহজমী।

রাগ হ'লে জনাবের হাতের কাজের গতি বেড়ে যায়। বাঁ হাত বাড়িয়ে সে বললে—ইঁটা লাত বউ! হাঁ। মসলা—জল। লাতিন। আচ্ছা—বাস করো।

খং—খং—খং—খং, ইঁটার উপর কর্ণির আঘাত কামারশালায় লোহার উপর হাতুড়ির আঘাতের শব্দের মত বাজতে লাগল।

জনাব বললে শ্যামাদাসবাবুকে—আপুনি যান বাবু। আজ থেকে আমি ফিতা মেপে হিসাব ক'রে কাম লিব। এই—এই রসিদ! এই হারামজাদী 'গুষনি'! এই!

জনাবের হাঁকে ডাকে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠল, সচকিত হয়ে উঠল সকলে। চালাও চালাও। কাম চালাও। হাঁ।

খস খস শব্দে কর্ণি চলতে লাগল জল-সপ-সপে চুন-সুরকী-মেশানো মসলার উপর। গাঁথনির ইঁটের গায়ে পাটা বসিয়ে তার গায়ে হাতুড়ির আঘাত পড়তে লাগল—ঠক—ঠক—ঠক—ঠক!

জনাব আবার কিছুক্ষণের মধ্যে খুসী হয়ে উঠল। হ্যাঁ। এই ত! তারপর সে কাহারদের বউ মতিবালাকে বললে—লে তো ভাই লাতবউ, দুপুরের আমেজে ধরতো একখানা মিহি গলায়। ধরতো! লাতিন তু ভাই একবার তামাক সাজবি।

মতির বড় বড় চোখ—মাথায় একরাশ রুক্ষ চুলে মস্ত বড় খোপা। জনাবের ভারী প্রিয় সে। এরই মধ্যে জনাব তার লজ্জার সঙ্কোচকে অনেকখানি সহজ ক'রে এনেছে। গান গাইতে বললে সে আর সলজ্জভাবে মুখ নামিয়ে মৃদু হেসে নিরুত্তরভাবে ঘাড় নেড়ে অস্বীকৃতি জানায় না। দিব্য গান গেয়ে যায়। এদের লজ্জা সঙ্কোচকে জয় করবার শক্তি এবং দক্ষতা জনাবের অদ্ভুত।

দাসী তামাক সাজতে বসল—মতি মৃদুস্বরে গান ধরলে—

"বাবুদের চি-লে কো-ঠার ছাদে
চিল কাঁদিছে গো ভরা দুপুরে—
চিলি পালায় কোথা বাসা
বেঁধেছে কোন তালপুকুরে।"

জনাব বললে—উঃ, কতক্কালকার গান! ছেরক্কাল রেজারা গায়।

দাসী হুঁকো কল্কে এগিয়ে দিলে। জনাব কল্কে খসিয়ে মতির হাতে দিয়ে বললে—লে পেসাদ করে দে ভাই। তু খেয়েছিস তো ভাই লাতিন? তারপর আবার বললে—দে উয়াদিকে এক ছিলম ভাল তামাক দে। লে রে ভাই—খা, খুসবয়ওয়ালা তামুক এক টান খেয়ে—লে জমিয়ে কাম কর।

আবার বললে, সান্ত্বনার সুরে—দেখ তুদের ভালর তরেই বুলি। ষোল বছর বয়সে বাবা কর্ণি হাতে দিয়েছিল, আর ওই কথাটি বুলেছিল আমাকে। বুলেছিল—বাপ্ এই কথাটি মনে রাখিয়ো; আগে ষোল আনি কাম দিবে তার বাদে ষোল আনি টাকাটি লিবে।

কর্ণির আঘাতে একখানা ইঁট ভেঙে আধখানা নিচে পড়ে গেল। জনাব একবার দেখে নিলে নিচেটা। তারপর বললে—জোয়ানী কাল হ'ল খাটবার আর কাম শিখবার কাল। যে শিখবে আখেরে ভাল হবে। লইলে আখেরে তার ঝরঝরে। ওই তিনকড়ে আর আমি এক সাথে কাম সুরু করেছিলাম। তা দেখ কেনে—তিনকড়েকে কেউ ডাকে? গারার (কাদাব) গাঁথুনি গেঁথেই তার দুনিয়ার বিত্তি কাবার হয়ে গেল।

মতি হেসে বললে—তিনকড়ি মিস্ত্রীর ওপর তোমার ভারি রাগ, লয়?

হা হা ক'রে হেসে উঠল জনাব। তুকে কে বুললে গো লাত বউ?

মতি সলজ্জ কৌতুকে বললে—রঙ্গুকে নিয়ে ঝগড়া আমরা জানি না বুঝি? হাড়িদের মেয়ে রঙ্গু!

উত্তরে জনাব মতির ডাগর চোখের সলজ্জ দৃষ্টি নিয়ে রসিকতা ক'রে বসল। মতি মুখে কাপড় দিয়ে বললে, মরণ।

জনাব বললে—ঠিক তুর মত চোখ আর চুল ছিল রঙ্গুর। তবে তুর চেয়ে অনেক কালো ছিল। তেমন কালই আর চোখে পড়ল না।

জনাব হঠাৎ ভারার উপর উঠে দাঁড়াল।

বর্ধিষ্ণু গ্রাম। তবে পাকা গাঁথুনীর ঘরের সংখ্যা কম। দক্ষিণে হরিশ-বাবুর দোতলা দু'মহলা দালান, মধ্যে শ্যামাদাসবাবুর এবং শ্যামাদাসের ভাইয়ের পাকা বাড়ী। তারপর মাধববাবুর প্রকাণ্ড বাড়ী। তার মধ্যে একখানা তিনতলা। তারই ওধারে রামবাবুদের একতালা দালান। মধ্যে মন্দির। রামবাবুদের পাঁচটা শিবমন্দির পাশাপাশি। ও পাড়ায় দুটো খুব প্রাচীনকালের মন্দির। ওই উত্তর দিকে একটা মন্দির। উত্তর-পশ্চিম কোণে জনাবের পাড়ার মসজিদ। মিনার দুটো সোজা উঠে গিয়েছে।

জনাব বললে—ওই দেখ নাতবউ। ওই রামবাবুর একতলা দালান। ওই দালানে আমার হাতে খড়ি। তিনকড়িরও হাতে খড়ি ওই হোথাকেই। রঙ্গু এল খাটতে। আমাদের থেকে রঙ্গু বয়সে বড়। এই তুর মতুন চোখ, দাসীর মতন চুল, আর সে কি কাল রঙ! দেখে আমি মাতাল হয়ে গেলাম। ইঁটা দিতে এল রঙ্গু। লিতে গিয়ে ঝুড়ির কিনারাটা হাত থেকে খসে প'ড়ে গেল। রঙ্গু মুচকি হেসে বললে—ফেললে তো। দেখো নিজে প'ড়ে যেয়ো না।

দাসী হেসে বললে—তা বাদে তুমিতো রঙ্গুক নিয়ে ভাগলে। তিনকড়ির ভয়ে।

—ভাগলাম? জনাবের ভুরু দুটো কুচ'কে উঠল। সে বললে—তিন-কড়ির ভয়ে ভাগি নাই।

* * * *

জনাবের বয়স এখন ষাটের কাছাকাছি। আঠার বৎসর বয়সে হাড়িদের মেয়ে রঙ্গুকে নিয়ে সে একদিন এখান থেকে পালিয়েছিল। লোকে বলে—তিনকড়ি রাজ-মিস্ত্রীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে রঙ্গুকে ছিনিয়ে নিয়ে আত্মরক্ষার

জন্যই জনাব পালিয়েছিল। জনাবের আত্মসম্মান এতে যেন আহত হয়। সে ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। তিনকড়ি? আরে—সরম কি বাত, লজ্জার কথা! মর্কটের মত চেহারা, উল্লুকের মত তরিবৎ, তার সঙ্গে পিয়ারীর দিল নিয়ে লড়াইয়ে না কি জনাবকে পালিয়ে যেতে হয়! সেকালের জনাবের চেহারা এরা দেখে নাই। তাই এমন কথা বলে।

পালিয়েছিল সে অন্য কারণে। রঙ্গু যদি যেতে রাজী না হ'ত তবু সে পালাত। বাপের সঙ্গে গিয়েছিল সে পাথর চাপড়ীর মেলা। বড় জাগ্রত পীরসাহেব সেখানে। দশ-বিশ হাজার লোক জমায়েৎ হয় পীরের অর্চনার জন্য। তার অসুখের জন্যই তার বাপ পীর সাহেবের কাছে মান্নত করেছিল। মান্নতের টাকা ধান মোমবাতী তেল নিয়ে সপরিবারে তার বাপ পাথর চাপড়ী গিয়েছিল। পথে কিছু দূরে পড়ে রাজনগর। এককালে নবাব ছিলেন এখানে। সেকালের অনেক ইমারত আছে। পাথর চাপড়ীর ফেরৎ রাজনগর দেখতে গিয়েছিল তারা।

জনাব অবাক হয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে প্রকাণ্ড এক তিনখিলানি ফটক। আশপাশ সব ভেঙ্গে গিয়েছে, কিন্তু তিনখিলান দাঁড়িয়ে আছে জমাটবন্দী পাথরের মত। কি তার বাহার, কি সব নক্সা! রাজ-মিস্ত্রীর ছেলে সে—নিজে রাজ-মিস্ত্রীর কাজ শিখছে কিন্তু এ জিনিস সে কল্পনাও করতে পারে নাই কখনও! মনে মনে হাজারো বার, লাখো বার সেলাম জানালে এই ইমারতের ওস্তাদ কারিগরকে। সবিস্ময়ে সে বারবার উচ্চারণ করলে—'শোভান আল্লাহ!'

ছেলের বিস্ময় দেখে বাপের কৌতুক হ'ল। সে ফিরবার পথে জেলার সদরের ইমারতগুলো দেখিয়ে নিয়ে এল। হিন্দুদের এক পুরানো মন্দির আছে। সে দেখেও তার তাজ্জব মনে হ'ল।

জনাব চোখে যেন যাদুর সুরমা প'রে ঘরে ফিরল। হাজার সেজের

ঝাড়-লণ্ঠনের হাজার বাতির আলোর জলসা থেকে ফিরে কাঠের ·পিলসুজের উপর মাটির প্রদীপ দেখে যেমন মেজাজ খারাপ হয়ে যায় তেমনি তার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। একমাত্র সান্ত্বনাস্থল ছিল রঙ্গু। গ্রামের বাইরে বিশ-পঁচিশটা ঝুরিওয়ালা বটতলায় রাত্রে কেউ যায় না। বলে ভূত আছে ওখানে। জনাবের ওই জায়গাটা খুব ভাল লাগে। বুড়া গাছটার ঘন ছায়ার তলায় কোন গাছ এমন কি ঘাস পর্য্যন্ত জন্মায় না,—পাকা মেঝের মত তকতক করে, মাথার উপরে ডালে পাতায় ছাউনীটি সুডৌল গোল, যেন ছাদের মত—গম্বুজের মত মনে হয়। মূল কাণ্ডটাকে চারদিকে ঘিরে বিশ-বাইশটা মোটা ঝুরি নেমে মাটির বুক ফুঁড়ে চলে গিয়েছে—বিশ-বাইশটা থামের মত। ছেলেবেলা থেকেই জনাবের এই গাছতলাটিকে বড় ভাল লাগত। এখন শুধু ভালই লাগে না, এখন তার মনে হয় খোদাতায়লার এ এক বাহারে ইমারত। ছেলেবেলায় এসে গাছটার কাছে বসে থাকত দিনের বেলা। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাহস বাড়ল—তখন বিকেলের দিকে এসে গাছটার তলায় গিয়ে বসত, ঘুরে ফিরে দেখত। রঙ্গুর সঙ্গে পরিচয় যখন প্রেমে পরিণত হ'ল, তখন সেই প্রেমে তার সাহস হয়ে উঠল দুঃসাহস। সন্ধ্যার পর সে এসে এই গাছতলায় দাঁড়িয়ে থাকত একটা মোটা ঝুরিতে ঠেস দিয়ে। ঝুরিটিতে এবং জনাবে যেন এক হয়ে যেত। গাছটার ঝুলে-পড়া ডালে ঝুলিয়ে দিত তার সাদা গামছা-খানা। দূর থেকে অন্য লোকে ভয় পেত, ভাবত সাদা কাপড় প'রে কেউ গাছের ডালে বসে দোল খাচ্চে; রঙ্গু দূর থেকে বুঝতে পারত' জনাবের নিশানা। সে নির্ভয়ে চলে আসত। রঙ্গুর সঙ্গে যতক্ষণ থাকত ততক্ষণ ছিল তার আনন্দ।

রঙ্গুর কাছে সে গল্প করত রাজনগরের তিনখিলানি ফটকের, সদরের চূড়ার, মন্দিরের। সদরের বড় বড় ইমারতের। এর ওর কাছ থেকে শোনা শহর মুরশিদাবাদের নবাবী আমলের ইমারতের। শহর কলকাত্তায়

এক মিনার আছে—নাম বলে মনুমেণ্ট, তলাতে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে তাকালে মাথার টুপি পাগড়ী খসে মাটিতে প'ড়ে যায়।

রঙ্গুর শুনতে ভাল লাগে—কিন্তু অবসর হয় না। তারও ঘর-দুয়ার আছে—মা-বাপ-ভাই আছে, স্বামী আছে। রাজ-মিস্ত্রীর সঙ্গে যারা মজুরনী খাটে তাদের সঙ্গে রাজ-মিস্ত্রীদের অপবাদ রটে, অভিভাবকেরা জানে—অপবাদের মূলে সত্যও আছে; তবুও নিয়ম হ'ল সবদিক মানিয়ে চলার। সেইটাই ভাল। রাজমিস্ত্রীদেরও এবিষয়ে একটা নিয়ম আছে, সেটা তারাও মেনে চলে; গোপন প্রেম যতই প্রবল হোক তারা প্রণয়িনীদের ঘরছাড়া ক'রে নিজের ঘরে আনে না। এতে বদনামী হয় তাদের। ব্যবসার ক্ষতি হয়। লোকে কাজ দিতে চায় না, মজুরনীদের কাজ করতে পাঠাতে চায় না তার কাছে।

অকস্মাৎ একদিন জনাব তাকে বললে—আমার সঙ্গে যাবি?

—কোথা? কোলকাতা না মুরশিদেবাদ, না ডিল্লী না লাহোর? তুমি তো নিয়ে গেছো আমাকে কত জায়গা! হাসলে রঙ্গু।

রঙ্গুর হাত চেপে ধরলে জনাব, বললে—না। ইবার আমি পালাব। খোদার কসম। একটু চুপ ক'রে থেকে জনাব বললে—বাপজীকে এত ক'রে বুললাম, তা সি বেতে দিবে না। বুলে মা-মরা ছেলে আমার তু, তুকে ছেড়ে থাকতে লারব আমি। আর গায়ে মায়ে সমান কথারে বাবা, ইখানেই কাল কেটে যাবে, খেয়ে পরে কোন রকমে—উ সব খেপামী করিস না।

—তা তো হ'ল। কিন্তু যাবে কোথা? জায়গাটা শুনি?

—সাহেবডাঙ্গার কুঠী জানিস?

—হ্যাঁ। রেশম-কুঠী আছে সাহেবদের।

—সেথাকে।

—রেশম-কুঠীতে কি করবা?

—সিখানে নতুন ক'রে সব ইমারত হবে। পুরানো সব ভেঙে নয়া-নয়া কারখানা করছে সাহেবানেরা। মোটা মজুরী। যাবি ?

রঙ্গু এই অল্প বয়সের মধ্যে বহুজনের প্রলোভনে পড়েছে, অর্থ-সামগ্রীও সে অনেক পেয়েছে, কিন্তু তাদের কেউ জনাবের মত নিজেকে দেয় নাই এমনভাবে। ফলে—সব দিক মানিয়ে, ঘর-সংসার এবং জনাব—এই দুইকেই বজায় রেখে মানিয়ে চলা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছে। সে প্রকাশ্যভাবে জনাবকে তার নিজের বলে এবং নিজেকে একান্তই জনাবের বলে ঘোষণা ক'রে দাঁড়াতে চায়। সে বললে—চল—তাই চল।

পরদিন সন্ধ্যায় আর তারা মিলিত হ'ল না। রাত্রি একটু গভীর হ'লে জনাব এসে দাঁড়াল গাছতলায় একটি পুঁটলি নিয়ে। ছোট বড় পাটা দু'খানা হাতে নিয়েছিল। রঙ্গুও এল একটি পুঁটলি নিয়ে। দু'জনে তারা বেরিয়ে পড়ল।

নদীর ধারে সাহেবডাঙ্গায় রেশম-কুঠী। একেবারে নদীর কিনারার উপর। সাহেবানদের কীর্তি দেখে জনাব বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল। শোভান আল্লা! ক্রোশ ভর কিনারা একদম নিচে থেকে উপর পর্যন্ত বাঁধিয়ে ফেলেছে। বাঘিনীর মুখের মধ্যে লোহার দস্তানা পরা হাত পুরে দিলে যেমন হয় দরিয়ার হাল হয়েছে ঠিক তেমনি। কষের দাঁত দিয়ে বেঁকিয়ে বেকিয়ে চিবুতে চেষ্টা করছে সে। বাঁধানো সীমানা বরাবর নদী এখানে ধনুকের মত বাঁক ঘুরতে বাধ্য হয়েছে।

বাঁধানো কিনারার উপর উঠেছে কুঠী। পাঁচীল চলে গিয়েছে তীরের মত সোজা। তার ভিতরে দেখা যাচ্ছে গোল থামওয়ালা দোতলা বাড়ী। সব চেয়ে বিস্ময়কর চৌপলা মিনারের মত উঠে গিয়েছে ইঁটের তৈরী চিমনী।

ঘাটে উঠবার সময় জনাব পোস্তার গাঁথনীটা বেশ ক'রে হাত দিয়ে

নেড়ে দেখলে। এ্যায় বাপরে বাপ! জলে একদম পাথর বনে গিয়েছে। ইঁটের উপরে ইঁট—তার উপরে ইঁট, মাঝখানের মসলা কোথায় কতটুকু, ধরতে পারা দূরে থাক আন্দাজও করা যায় না।

সাহেবের সামনে গিয়ে সেলাম ক'রে সে দাঁড়াল। কুঠীর তখন অনেক কাজ, নতুন বয়লার বসবে, চিমনী তৈরী হবে; নতুন ক'রে পাঁচশো 'খাই' তৈরী হবে, তার শেড চাই। নতুন গুদাম হবে, কোয়ার্টার হবে, আণ্টাঘর হবে। অনেক কাজ, অনেক মিস্ত্রী চাই, অনেক লোক চাই। কাজ পেয়ে গেল জনাব। কুঠীর দারোয়ান তাকে সঙ্গে ক'রে জিম্মা ক'রে দিলে বড় মিস্ত্রীর—সেখ খুরসেদ আলি।

ঘাড় কামানো বাবরী চুল—চেরাসিঁথী, মাথায় মলমলের টুপী, গায়ে পাঞ্জাবী আস্তিন, পরনে চেকদার লুঙ্গি, পায়ে ফুলদার চকচকে জুতা—নাম পামশু। দোষে গুণে বেশ মানুষ ছিল খুরসেদ। বয়স তখন তার চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। জনাবকে একনজর দেখলে—জনাবকে দেখতে গিয়ে পিছনে রঙ্গুকে দেখে সে বললে—ও? ও কে?

জনাব বললে—আমার লোক। তারপরই নিজেকে সংশোধন ক'রে নিয়ে বললে—আমার বিবি।

খুরসেদ হেসে বললে—ঝুট।

তারপর আবার হেসে বললে—তাতেও কোন হরজা নেই। তুম্ রাজমিস্ত্রী হ্যায়—উ তুমারা রেজা হ্যায়। লেগে যাও কাজে। পিঠের দিকে জামার গলার ঝুলানো ছিল—ভাঁজকরা ইঞ্চি মাপের স্কেলটা—সেটা সে টেনে নিয়ে মাপতে বসল গাঁথনীটা। অবাক হয়ে গেল জনাব। সেও লাগল কাজে পরের দিন থেকে।

নদীর ধারের পলিমাটির তৈরী ইঁট—পগমিলে মাটি তৈরী হয়েছে, বাক্স ফর্মায় ছ'খানি পিঠ একেবারে যেন র‍্যাঁদা করা কাঠের মত সমান; একখানির উপর আর একখানি রাখলে বেমালুম বসে যাবে—কেতাবের ভিতরের সমান

মাপে কাটা কাগজের উপর কাগজের মত। পাতলা গদের আঠার মত এক আস্তরণ মসলা কণি চালিয়ে টেনে দিয়ে একখানার পর একখানা ইঁট বসিয়ে যাচ্ছে। সোহাগার পান দিয়ে জোড়া সোনার দানা দানার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে। খিলান হচ্ছে—সাহেব লোকের আণ্টাঘর—গান হবে, বাজনা হবে, সাহেব মেম লোক নাচবে—জোড়াবেধে; গোটা ঘর জোড়া এক খিলান, দুই ধারে দুই থাম। বিশ ফুট চওড়া খিলান। মোটা শালের রোলা দিয়ে মাচা বেধে খিলানের ঠেকা বাধা হয়েছে, তার উপর ইঁট গাঁথা হচ্ছে। খিলানের ইঁট সোজা বসছে না, বসছে আড়াআড়ি। মসলা নিজে দাঁড়িয়ে তৈরী করিয়েছে বড় মিস্ত্রী। 'বিলাইতী মাটি' আর কাশীর চিনির মত মিহি বালি মিশিয়ে শুকনা অবস্থায় তাকে কেটে ঘেঁটে মিশিয়ে জল ঢেলে ক্ষীরের মত পাতলা ক'রে তৈরী সে মসলা। সেই মসলা ঢেলে দিচ্ছে ফাঁকে ফাঁকে, কণি দিয়ে মেজে-ঘষে জোড় মিলিয়ে দিচ্ছে। বিলাইতী মাটি ওই এক তাজ্জবের মসলা। বালিতে আর 'বিলাইতী মাটিতে' মিশিয়ে তাল পাকিয়ে রেখে দাও ঠাণ্ডায়, একটু শুকালে ফেলে রাখ পানিতে; একদিন পর তুলে নাও—বাস্--পাথরের গুলী হয়ে যাবে।

আণ্টাঘরের গাঁথনী শেষ হ'ল। আরম্ভ হ'ল পলেস্তারা। সাহেব বলেছিল বিলাতী মাটিতে বালি মিশিয়ে পলেস্তারা কর। খুরসেদ বললে—হুজুর পঙ্কের কাম হ'ক—মার্বেলকে মাফিক জিল্লা দেগা। উসকে পর আঁখ রাখনেসে দরদ নেহি লাগে গা।

তিনকড়ি রাজ পঙ্কের কাম হয়তো চোখে দেখেছে। এখানে জনাব কিছু করেছে। কিন্তু সে কাজের হদিস সে জানে না। 'বিলাইতী মাটি' এখানেও আমদানী হয়েছে অনেকদিন। তিনকড়ি বুদ্ধি খাটিয়ে বেশী মজবুত করবার জন্য 'বিলাইতী মাটির' সঙ্গে মেশাবার বালির ভাগ কমিয়ে চূণ মিশিয়েছিল তার বদলে। উল্লুক --বুরবক --গিধ্বড় কাঁহাকা! মনে পড়লে জনাবের হা-হা করে হাসতে ইচ্ছা করে। মদের সঙ্গে দুধ! আরে উল্লুক। হায় নসীব জনাবের! বিলাইতী মাটির সঙ্গে চূণা! তোবা! তোবা!

ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল গাঁগনী !

হায় খোদা ! হে ভগবান ! একাজ এত সোজা ? একি এমনি হয় ! খোদাতায়লা দুনিয়া তৈরী করলেন—কোথাও গড়লেন পাহাড়, কোথাও গড়লেন নদী, কোথাও গড়লেন বন—সমান মেঝের মত দুনিয়ার ক্ষেত গড়লেন—কিনারায় কিনারায় সমুদ্দুর। তাঁর কাছ থেকেই না বড় বড় মানুষ দামী মগজে ভরে নিয়ে এল সেই বিদ্যা। সে কি সোজা ! কত বড় বড় কেতাব লিখেছে সব বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার, কত নক্সা—কত মসলা, কত মাপ—কত হিসাব। সে দেখেছে। চোখে দেখেছে সে সব কেতাব সাহেবানদের টেবিলের উপর। খুরসেদ কতক শিখেছিল তাদের কাছে, কতক শিখেছিল তার পুরোনো দেশী ওস্তাদের কাছে—মুরশিদাবাদের বুড়া ওস্তাদ কারিগর, মগজের খোঁপে খোঁপে ছিল তার নবাবী আমলের ইমারতী এলেম। খুরসেদের কাছে জনাব অনেক কষ্টে আদায় করেছে এইসব বিদ্যা, এইসব এলেম। বহুৎ দাম তাকে দিতে হয়েছে এর জন্য তাকে। রঙ্গুকে দিতে হয়েছে খুরসেদকে।

রঙ্গুকে দেখে নেশা জাগল খুরসেদের। জনাবের উপর সে সদয় হ'য়ে উঠল। জনাবের কাছে সে পান চাইত রোজ। বলত রঙ্গিলা বিবির হাতের সাজা পান খাওয়াও মিয়া। এই সূত্রপাত। তারপর একদিন বললে রঙ্গিলা বিবির হাতের রান্না খাওয়াও জনাব ভাই। তখন জনাবকে রাখত সে ঠিক নিজের পাশে। জনাবও তখন কাজের নেশায় বিভোর। তখন খুরসেদের এনেক নজরের কারণ ঠিক ধরতে পারে নাই। ভাবত, তার কাজে খুশী হয়ে বড়মিস্ত্রী তাকে ভালবাসছে, তাকে ঠিক ভাইয়ের মত দেখছে, তাই তার বাড়ীতে নিজে থেকে যেচে নিমন্ত্রণ নিলে। রঙ্গুর হাতের রান্না খেতে চাওয়ায় খুরসেদের কিছু মতলব ঠাওর করবার মতন কিছু ছিল না। সে নিজেই পঞ্চমুখে রঙ্গুর রান্নার প্রশংসা ক'রত। রঙ্গু হাসত কাজের যোগান দিতে দিতে।

রঙ্গু সেদিন হাসতে হাসতে বলেছিল—তাই নেমন্তন্ন কর বড়মিস্ত্রীকে। খুব আচ্ছা ক'রে কলিজার কালিয়া রেঁধে খাওয়াব।

জনাব সেদিনও বুঝতে পারে নাই কথাটা।

বুঝতে পারলে, হঠাৎ একদিন খুরসেদ তাকে বললে—রঙ্গিলা বিবিকে তুমি ছেড়ে দাও জনাব ভাই

চমকে উঠল জনাব।

—আমি ওকে কলমা পড়িয়ে নেকা করব।

স্তম্ভিত হয়ে গেল জনাব।

বড়মিস্ত্রী হেসে বললে—রঙ্গু চলেও গিয়েছে আমার বাসায়। সেও রাজী আছে। আর বেশী গোলমাল করলে কোন ফায়দাও হবে না এতে। সেটা তুমি সহজেই সমঝাতে পার।

সমঝাতে হ'ল বৈকি। সারারাত নদীর বালিতে বুক চাপড়ে কেঁদে সে বুঝলে। মনকে বুঝালে। তারপরের দিনটাও সে বুঝলে। তার পরদিন সে হাসিমুখে এসেই খুরসেদকে বললে—তাই হ'ক বড়ভাই। হাজার হ'লেও তুমি ওস্তাদ।

বড়মিস্ত্রী বললে—তুই বেছে নে, এত কামিন রয়েছে—যাকে পছন্দ হবে তোর বল।

পছন্দ সে করলে একজনকে সে কিন্তু কথা বললে না বড়মিস্ত্রীকে। খুরসেদের বাসায় ছিল কিছুদিন আগে নেকা করা এক স্ত্রী। তাকেই নিয়ে একদা সে সাহেবডাঙ্গা থেকে গভীর রাত্রে বেরিয়ে পড়ল। তখন আণ্টাঘরের মেঝে হয়ে গিয়েছে—ছাদ হয়েছে, পলেস্তা হয়েছে—থামে পঙ্কের কাজের পালিশ হয়েছে। গাথা হচ্ছিল তখন চিমনী। মাঝের জায়গায় গাঁথনী চলছিল, ভারার উপর থেকে নিচের দিকে চাইলে শরীর শির-শির ক'রে—মাথা ঝিম-ঝিম করে। খুরসেদ তখন কিছু কিছু সন্দেহ করতে সুরু করেছে। তার ভয় হ'ল হঠাৎ খুরসেদ তাকে ভারা থেকে ঠেলে ফেলে

দিতে পারে। শয়তান, ও সব পারে। পুরো চিমনীটা গাঁথতে সে পারলে না—এই আফশোষ নিয়েই সে হামিদনকে নিয়ে পালাতে বাধ্য হ'ল।

ঘণ্টা বাজছে। ঢং ঢং ক'রে পাঁচটা ঘণ্টার আওয়াজ হ'ল। ইস্কুলের ঘণ্টা, পাঁচের ঘণ্টা শেষ হ'ল, বাজল তিনটে। জনাবের চমক ভাঙল—কতকালের কথা! কাজ করতে করতেই সে ভাবছিল। হাতের শেষ ইঁটখানি বসিয়ে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

মতিবালা প্রশ্ন করলে—কি ভাবছিলা গো ওস্তাদ? রঙ্গুকে?

হেসে জনাব বললে—উঁহু।

—তবে?

—তুর ডাগর চোখ দু'টি ভাবছিলাম। সে তার গালে একটি টোকা মেরে দিলে।

রাগের ভঙ্গিতে মুখ গম্ভীর ক'রে মতি বাঁকা দৃষ্টিতে চেয়ে বললে—উ কি? না! হ্যাঁ!

নিচে থেকে ডাকলেন শ্যামাদাসবাবু—জনাব!

—এই যাই আজ্ঞা। আজ দেখেন কাজ। মেপে দেখেন।

—কাটান দিলে?

—কাল দিব। ভেবে দেখলাম—আজ দিলে জেরা সে খুঁত থাকত।

শ্যামাদাস চঞ্চল হয়ে নখ খুঁটতে আরম্ভ করলেন—শোন ত' তুমি। শোন ত। একে বলে—তোমার মতলবটা কি একবার খুলে বলত শুনি।

জনাব বললে—পেটে এখনও দানা-পানি পড়ে নাই বাবু। এখুন লয়। আসব সনজের সময়। এখুন হয়তো খারাপ বাত বেরিয়ে যাবে। সনজেতে আসব।

*   *   *   *

সন্ধ্যায় সে এল। এখন তার গায়ে ফতুয়ার বদলে জামা। পরনের

কাপড় বহরে বড়। কোঁচাটি উল্টে গুঁজে প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে মানানসই ক'রে নিয়েছে।

শ্যামদাসবাবু বললেন—লোকে যা বলে সে মিছে নয়। লাগলে একে বলে থামতে চাও না।

জনাব হেসে বললে—এ আপুনি কি বুলছেন হুজুর? কাম শেষ না হ'লে থামব কি ক'রে গো। সবেরই একটা সময় আছে, থামবারও একটা সময় আছে। এ কি বাজীকরের হুকার জল—হই বসায়ে দিলে—দিয়ে বুললে পড়, জল পড়তে লাগল—বুললে থাম, ব্যস থেমে গেল।

শ্যামাদাসবাবু বললেন—আজ কাটান মারবার কথা—তুমি নিজে—

—হাঁ বলেছিলাম। তা দেখলাম আজ যদি এইখানে কাটান মারি তবে জেরা সে খুঁত হয়, খারাপ হয়ে যায় মন্দিল। ধরেন সবেরই একটা হিসাব আছে। ফিতা ধরে মাপ—ফুট ইঞ্চির হিসাব।

—কিন্তু এরই মধ্যে কত উঁচু হয়েছে দেখেছ?

জনাব ভুরু কুঁচকে হাসলে—উঁচু হয়েছে! ওই কি উঁচু? উঁচাই যদি না হবে, তবে মন্দিল করছেন কেন হুজুর? একখানা সাত ফুট বাই আট ফুট গারার গাঁথনী ঘর করলেই তো হ'ত। মাথার উপর একটা তেকোনা পেরাপেট গেথে একটা ত্রিশূল বসায়ে দিলেই হ'য়ে যেত। তা বলেন না কেনে—এখুনও হবে। তাই ক'রে দিছি আপনার। গাঁথুনী বন্ধ থাক, কড়ির অডার পাঠায়ে দিন, টালি আনিয়ে নি—

বাধা দিয়ে শ্যামাদাস বললেন—আঃ, তুমি বড় একে বলে বাজে বক জনাব। তা' কে বলেছে হে বাপু? চঞ্চল হয়ে তিনি চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন, ঘুরতে লাগলেন ঘরময়, আঙুল দিয়ে নখ খোঁটার মাত্রা বেড়ে গেল।

জনাব বললে—তবে আপনি বলছেন কি? মন্দির হবে আপনার। আমার লয়। আমি লিয়ে যাব না ঘরে। লোকে বুলবে না জনাব সেখের

মন্দির, বুলবে অমুক বাবুর মন্দিল। হুজুর, মন্দিল লোকে করে কেনে? ঘর করলেই তো হয়। হুই মাথা লম্বা ক'রে আকাশের গায়ে মার দিয়ে মন্দিল করে কেনে? তার উপরে দেয় আপনার কলস, তার উপর ত্রিশূল—কেউ দেয় চক্র। কেউ বা দেয় পিতলের—কেউ বা দেয় সোনার। কেনে দেয় হুজুর? উঁচার জন্তেই মন্দিল। আপনার দেবতা—আপনার ঠাকুর যে ইমারতে থাকবেন, সে নিচু হবে মানুষের 'থনি' (চেয়ে)? আপুনি থাকবেন দোতলা ঘরে, তার চিলকোটা হুই উঁচা আর ঠাকুরের মন্দিল এই নিচু হবে? মন্দিল হবে, দেবতার মন্দিল, আকাশের গায়ে মার দিয়ে মাথা উঁচা ক'রে খাড়া থাকবে, সুরুযের আলো প'ড়ে সোনার কলস ঝলবে। গাঁয়ের লোকের ঘুম ভাঙবে সকালে, আল্লাকে—ভগবানকে প্রণাম করতে মুখ তুলবে, আপনার মন্দিলের চূড়া চোখে পড়বে। তারা প্রণাম করবে আপনার ঠাকুরকে। বলবে—হ্যাঁ অমুক বাবু একটা আদমীর মতন আদমী ছিল, ভকত ছিল বটে, মন্দিল ক'রে গিয়েছে বটে। বেহেস্তে থেকেও শুনবেন সে কথা আপনি। মন্দিলের চূড়া ক্রোশ বরাবর দূর থেকে দেখা যাবে। তবে সে মন্দিল। গাঁয়ের চার পাশে গাছপালা, জঙ্গল মনে হয় দূর থেকে। সেই জঙ্গলের মাঝখানে গাছপালার মাথা ছাড়িয়ে আশ্বিনের টুকরাভর মেঘের মত মন্দিলের মাথা দেখা যাবে। লোকের প্রথমে মনে হবে মেঘই বটে। তা'পর মনে হবে—না, মেঘ তো নয়; মন্দিল—এ মন্দিল। তারিফ করবে লোকে। বলবে—হ্যাঁ, ইমানদার লোকের কীর্তি বটে। দেশদেশান্তরের লোক কেউ আসছে ই গাঁয়ে। পথে রাহীকে শুধালে অমুক কত দূর ভাই? লোকে বুলবে আর খানিকটা এগিয়ে গেলেই নজরে আসবে, পহেলেই দেখতে পাবে—এক মন্দিলের চূড়া। ওই চূড়াতে চোখ রেখে চ'লে যাও। কার মন্দিল ভাই? অমুক বাবুর মন্দিল। হ্যাঁ!

শ্যামাদাসবাবু কথার মাঝখানেই পায়চারী ছেড়ে এসে চেয়ারে বসেছিলেন। স্তব্ধ হয়ে তিনি বসে ছিলেন। নখ খুঁটছিলেন অত্যন্ত মৃদুভাবে। জনাব

তার কল্কের স্তিমিত আগুনে ফু দিতে দিতে বাইরে গিয়ে বসল। সেখানে আড়ালে বসে তামাক খেতে লাগল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললে,—বাবু।

—উঁ।

—বুলেন, কথাটা আমি ঠিক বুলেছি কি না।

শ্যামাদাস বাবু বললেন—হুঁ! কথা তো ভালই বটে। একে বলে শুনতেও ভাল লাগছে। কিন্তু—

—উয়াতে আর কিন্তু নেই হুজুর। সাহেবডাঙ্গার কুটি ‘থনে’ গেলাম বর্ধমান। শুনলাম রাজবাড়ীতে ইমারত হবে নতুন। বুঝলেন? পথে পেরথম চোখে পড়ল সারি সারি মন্দিল—একশো আট শিবমন্দিল। দুধের মতন সাদা মন্দিলের সারি; আঃ মাঠের মধ্যেখানে—দু’ কোশ দূর থেকে নজরে পড়ছে, আর মাঝে মাঝে গাছের আড়াল পড়ছে। তারপর কাছে এলাম; হুজুর সেখান থেকেই একশো আট সেলাম দিলাম রাজাকে—আর একশো আট সেলাম দিলাম কারিগরকে। তা বাদে আপনার রাজবাড়ীর ইমারত, সে কথা বাদই দেন। রাজা বাদশা নবাবদের কীর্তিই আলাদা। কিন্তু আপনিও তো আমীর লোক—আমীরের মতন কীর্তি তো আপনাকে করতে হবে। রাজার বাড়ীর থাম নিচে তলা থেকে উঠে গিয়েছে তিন তলার ছাদ পর্যন্ত। পঙ্কের কাজ করা গোল থাম। সে সব কথা না হয় বাদই দিলাম। রাজবাড়ীর কাম হয়ে গেল, শুনলাম কাম হবে কাছেই এক জমিদার বাড়ীর—মন্দিল হবে। ন’টা চূড়া হবে মন্দিলের, দাওয়া হবে মানুষের গলা ভর উঁচা, কলকাতার ইঞ্জিনীয়ার নক্সা করেছেন।

শ্যামাদাসবাবু বেরিয়ে চলে গেলেন।

জনাব অপেক্ষা ক’রে ব’সে রইল। কিছুক্ষণ পর সেও উঠল। কি করবে সে ব’সে থেকে। ঝকমারীর কাম করেছে সে এই বাবুটির কাজ হাতে নিয়ে। দিলদার লোকের কাম করেও সুখ আছে। তাতে মজুরী কম হয়

সেও আচ্ছা। দিলদার লোক ছিল বর্ধমানের সেই জমিদার। ঘুর ঘুর ক'রে বাবুসাহেব মন্দিরের চারি পাশে ঘুরচেই।—হাঁ, ওখানটা কেমন যেন বেঁকে গেল মিস্ত্রী?

—না হুজুর, ঠিক আছে, নিচে থনে উচাতে এমন দেখায়।

— মিস্ত্রী দেখ, আমার ভারি ইচ্ছে—

—বলুন হুজুর, বলুন কি ইচ্ছে?

—ইঞ্জিনীয়ার করেছেন বটে, মাঝখানের চূড়াটি এই রকম, কিন্তু আমার ইচ্ছে, বর্ধমানের সর্বমঙ্গলার মন্দির তুমি দেখেছ তো? সেই রকম হয়।

—হবে—সেই রকমই হবে।

—আর দেখ, ভেবেছিলাম মন্দিরের সামনে যে খিলানের বারান্দা ওইখানেই শুধু মার্বেল দেব। তা না সামনের যে খোলা বারান্দা ভিজে রোয়াক ওটাতেও মার্বেল দেব। কি বল?

—হাঁ হুজুর। খুব ভাল হবে।

বর্ধমানের ওই গাঁয়েই হামিদন মরেছিল। বিশ্রী ঘা হয়ে মরেছিল হামিদন। হামিদনের দোষ নাই। সে ঘা তাকে ধরিয়েছিল জনাব। জনাবকে ধরিয়েছিল বর্ধমানের কামিন সৈরভী। ছিপ-ছিপে পাতলা চেহারা, কোঁকড়ানো চুল, ঢুল-ঢুলে চোখ; ঠোঁট দুটো একটু উঁচু ছিল সৈরভীর; হাসলে দাঁতের সঙ্গে মাড়ি বেরিয়ে পড়ত। নেশা লাগত তাকে দেখে। কিন্তু বিষ ছিল তার মধ্যে। সেই জনাবের জীবনে প্রথম বিষ। জনাব নিজের চিকিৎসা করিয়েছিল। হামিদন লুকিয়েছিল প্রথমটা। তারপর যখন প্রকাশ করতে বাধ্য হ'ল, তখন সে বর্ধমান ছেড়েছে। দূর পাড়াগাঁ থেকে চিকিৎসা ভাল হ'ল না। মরে গেল হামিদন।

—নসীব—নসীব জনাবের। হামিদন মরে গেল—মন খারাপ হয়ে গেল জনাবের। জমিদার বাড়ীর কাজ শেষ হ'তেই সে ফিরে এল এগাঁয়ে।

বাপজানও সেই সময় অসুখে পড়েছিল। বাপজান বললে, আর বিদেশে যাস না বাপ। যে ক'টা দিন আমি বাঁচি ইথানেই থাক। মাধববাবু বড়লোক হয়েছে। ইমারত ক'রবে অনেক। থাক এইথানেই। কাজকাম কর। সাদী নিকা কর।

জনাব থেকে গেল। নসীব জনাবের।

জনাব বেরিয়ে আসছিল শ্যামাদাসবাবুর ওখান থেকে। থমকে সে দাঁড়াল শ্যামাদাসবাবুর বৈঠকখানা থেকে বেরিয়েই পতিত জায়গাটায়—মন্দিরের সামনে।

মন্দিরের পিছনে পুকুর। পুকুরের ওপারে বোধ হয় চাঁদ উঠেছে।

ওঃ—মন্দিব যথন শেষ হবে, তথন এমন বাহার দেবে!

কে? কে উথানে? মন্দিরের সামনে উপরের দিকে মুখ ক'রে কে দাঁড়িয়ে আছে? জনাব এগিয়ে গেল। সে বিস্মিত হয়ে গেল। শ্যামাদাসবাবু উপরে আকাশের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। জনাবের বুঝতে দেরী হ'ল না—বাবু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে মনে মনে মন্দিরটাকে ছকে দেখে নিচ্ছেন।

—হুজুর?

শ্যামাদাস চমকে উঠলেন।

—আজ্ঞে আমি জনাব। সেলাম। তা হ'লে যাই আমি।

—একে বলে, কাল থেকে জোর দিয়ে কাজ আরম্ভ কর। একে বলে বড় হ'ক ছোট হ'ক তাড়াতাড়ি শেষ কর।

—যো হুকুম হুজুর।

জনাবও একবার আকাশের দিকে তাকালে। তার চোথের সামনে ভেসে উঠল গোটা মন্দিরটা।

* * *

মন্দিরের কাজ চলেছে। খাঁজে খাঁজে অল্প অল্প ভেঙে চারখানি দেওয়াল পরস্পরের দিকে এগিয়ে আসছে, সঙ্গে সঙ্গে উপরের দিকে উঠে চলেছে। মন্দিরের চূড়ার মাঝখান ছাড়িয়ে গিয়েছে মনে হচ্ছে। জনাব ভারার উপর দাঁড়িয়ে দেখে। হুই দেখা যাচ্ছে—তাদের পাড়ার মসজিদের মিনার। ও মিনারের আধখানা জনাবের হাতের গড়া। যে বৎসর সে ফিরল—সে সালটা পুরানো লোকের সবার মনে আছে। বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। দু'তিন বাঁশের উপরে বাঁধা ভারা যখন ঝড়ে দোলে, তখনই জনাবের সে দিনকার কথা মনে পড়ে। দুনিয়াটা দুলে গেল ঝড়বাজা ভারার মত। বড় বড় দালান ভেঙে পড়ল। ছাদে ফাট ধরল। সে ভূমিকম্পে ভেঙে গেল মসজিদের দক্ষিণ তরফের মিনার। এ গাঁয়ে তখন দালান কোথা? হরিশ-বাবুর দালান, শ্যামাদাস বাবুর দালান হয়েছে সবে। রামবাবুদের একতলা দালানটাকে সে ইমারতই বলে না। ইঁটের পাঁজা। পলেস্তারা নাই, পয়েন্টিং পর্য্যন্ত না। আরে, আসল মানুষের গাঁথনীটা তো হাড়ের; গাছের ভিতরটা তো কাঠ; হাড়ের কাঠামোর উপর মাংস লাগিয়ে পঙ্কের কামের পলেস্তারার মত চামড়া দিলে তবে না সে মানুষ, গাছের গায়ে বাকল না হ'লে কি সে গাছ? নোনা ধরেছে এর মধ্যে।

মিনারটার মাপ তার মনে আছে। তার ইচ্ছা ছিল মিনারটাকে আরও খানিকটা উঁচু করে সে তৈরী করে—কিন্তু তাহ'লে উত্তর তরফের মিনারটার সঙ্গে বেমানান হ'ত। অনেক ভেবে তার মনে হয়েছিল, তাতেই বা ক্ষতি কি? এ দিকেরটা হোক না বড়। পাশাপাশি ছোট বড় তালগাছ দাঁড়িয়ে থাকে—সে কি খারাপ লাগে দেখতে! গড়তে পারলে বেমানানের মধ্যে এমন বাহার আনা যায়, সে একটু খেয়াল করলেই বুঝতে পারা যায়। ট্যারা কামিন টুনীর দিকে সব মাতালের মত চেয়ে থাকে অথচ ওটা কেউ ধরতে পারে না। মুস্কিল তো ওই, সমঝদার লোক মেলে না। বড় বড় ইঞ্জিনীয়ার হ'লে বুঝতে পারে। এখানকার লোকে বুঝতে পারে নাই তার কথা। সেই পুরানো মাপে উত্তরের

মিনারের সঙ্গে জুড়ি মিলিয়েই গড়তে হয়েছিল তাকে। হায় আল্লা—নিজের বাড়ীর দিকে কেউ খেয়াল ক'রে চেয়ে দেখে না? আপনার বাচ্চাদের বড় থেকে ছোট তক পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে দেখ দেখি!

আঃ। একটা ছোট্ট ইঁটের টুকরো লেগেছে জনাবের হাঁটুতে। কে? হুঁ! রসিদটা ছুঁড়েছে মতির গায়ে। দুটোতে চুলবুল করছে। গম্ভীরভাবে জনাব বললে—কাম কর রসিদ। কাম ক'রে যা।

মসজিদের মিনারের চেয়ে মন্দির উঁচু হবে অনেক।

মাধববাবুর তিনতলা নয়া দালানটাই এখানকার সবচেয়ে উঁচু বাড়ী। তিনতলার ছাদের সিঁড়ির মাথাটা অনেক দূর থেকে দেখা যায়। ওইটাই এখানকার সবচেয়ে ভাল বাড়ী। কলকাতার মিস্ত্রী এসে ওর চারিপাশে নক্সা কেটে গিয়েছে, থামের মাথায় কার্ণিসে কারিগিরি ক'রে গিয়েছে। হাঁ, সে লোকটা মিস্ত্রী একটা। বিলাইতী মাটি আর বালিতে কার্ণিসের মাথা জমিয়ে কেটে কেটে বার করত নক্সা। দুই হাতে সাদা ফুল। ঠোঁটে গালে সাদা ফুল—খাটো মানুষটা পাজামা পরত, মাথায় দিত মখমলের কালো টুপি, গায়ে রঙীন কামিজ। নক্সার মিস্ত্রী ভাল। কিন্তু ছাদ খিলানের কিছু জানে না। সে ছাদ খিলানে এই জনাব আলী সেখ!

এখানকার ওই পুরানো কয়টা মন্দির—মসজিদের গম্বুজে খিলান ছাড়া তামাম ছাদে জনাবের কর্ণির দাগ আছে। ভূমিকম্পে সব ছাদে ফাট ধরেছিল, জনাব কতক তার তুলে ফেলে নতুন তৈরী করেছে। কতক—যে সব ফাট অল্প স্বল্প—সে সব বহুৎ হুঁসিয়ারির সঙ্গে মেরামত ক'রে জোড় মিলিয়ে দিয়েছে। বেমালুম জমে ফের এক হয়ে গিয়েছে। বড় বড় সার্জন ডাক্তার ভাঙ্গা হাড় কাটা অঙ্গ জুড়ে দেয়—এমন জুড়ে দেয় যে একটু দাগ ছাড়া কিচ্ছু বুঝতে পারা যায় না, তাও কাটা চামড়া সেলাই করলে, তবে দাগটা থাকে, নইলে বেমালুম জুড়ে যায় শুধু জুড়েই যায় না—ঠিক সহজ শরীরের মত

জোরালো হয়। জনাবের ছাদ জোড়ার কেরামতিও ঠিক তেমনি। এক ফোঁটা জল পড়ে না আজও।

শ্যামাদাসবাবু ডাকলেন নিচে থেকে—জনাব।

—বাবু!

—ঝিনুক তা হ'লে কিনতে আরম্ভ কবি। এনেছে আজ ক'জন।

—হাঁ হুজুর। উয়াতে আর কথা কি।

পঙ্ক চুণ তৈরী হবে। মন্দিরের একদম মাথার অংশটা পঙ্ক চূণে পলেস্তারা হবে - মাজাই হবে। নেশা ধ'রেছে শ্যামাদাসবাবুর।

চার দেওয়ালের উপর 'পারা লেবেল' বসিয়ে দেখলে জনাব, মাঝখানে চার কোণায় বসিয়ে দেখে নিলে, ঠিক মাঝখানটিতে মুক্তার দানার মত টল-টল করছে পারা।

—ঠিক হ্যায়, চালাও, হাত চালাও, হুঁস ক'রে রসিদ—হুঁসিয়ারী ক'রে কাম করবি।

ইঁটের উপর কর্ণির ঘা পড়ছে খন-খন-খন-খন। চূড়ার কাটান যেখান থেকে আরম্ভ হয়েছে, সেখানে লোহার কড়ি বেরিয়ে নিচের দাওয়ার কিনারায় গোল থামের মাথায় বসেছে। বরগা পড়েছে, তার উপর হচ্ছে ছাদ। কামিনের দল তালে তালে কোপা পিটছে, বাজনা বাজছে যেন। জনাব ভারা বেয়ে গেল ছাদে। মাটির বড় জালায় মসলা ভিজানো জল রয়েছে, জনাব নিজ হাতে মগে ভরে সেই জল ঢেলে দেয়। চালা দিদিরা—হাঁ। সমান জোরে। এক ঘা বেশী জোরে এক ঘা কম জোরে যেন না হয়। আচ্ছা—বহুৎ আচ্ছা!

যে দিকে বারান্দার ছাদ পিটছিল কামিনরা—তার বিপরীত দিকে গিয়ে জনাব দাঁড়াল। ডাকলে—ঠাকুরঝি ইদিকে ভাই শুন ত' একবার।

ঠাকুরঝি এখন প্রৌঢ়া—এককালে সে জনাবের পাশে থাকত, মতির এবং দাসীর মত। প্রৌঢ়া এসে দাঁড়াল।

নিম্নস্বরে জনাব বললে—মতিটার সঙ্গে রসিদটার কাণ্ডটা কি রকম বল দেখি ?

ঠাকুরঝি একটু বিরক্তিভরেই বললে—মরণ, ওই আবার শুধাতে হয় না কি।

—হুঁ। জনাব উঠে চলে গেল।

ঠাকুরঝি আপন মনে বললে—মরণ, বুড়ো বয়সে উদিকে চোখ কেনে ?

জনাব কাজে লাগল। হঠাৎ বললে—উহুঁ—ই—হচ্ছে না। মতি তু নিচে ছাদের কাজে যা গো। এত উপরে ভারায় তু লারবি। হেই রাণী—তু উপরে উঠে আয় গো।

রাণী মধ্য বয়সী মেয়ে। সে সদ্য এ পদ থেকে খারিজ হয়েছিল।

মন্দিরের গাঁথনী শেষ ক'রে জনাব দাঁড়াল মাথায় কলস বসাবার শিকটা ধ'রে।

শ্যামাদাসবাবু নিচে দাঁড়িয়ে দেখলেন—জনাবকে দেখাচ্ছে ঠিক তাঁর মত খাটো মাথার মানুষ। খুসী হয়ে উঠল তাঁর মন। তবু মনটা খুঁত খুঁত করে। অনেক টাকা বেশী খরচ হয়ে গেল। অনেক টাকা !

জনাব দেখছিল—গ্রামের ঘরবাড়ী গাছপালার মাথার উপর দিয়ে তার নজর চলেছে—ওই নয়াগাঁ—ওই বামনপাড়া—ওই দেবীপুর—ওই মাঠে চৌধুরী দীঘি—ওই নয়ানজুলির মাঠ—ওই নদী কিনারের আঁকা বাকা জঙ্গল—ওই সরকারী পাকা শড়ক লাল ফিতার মত চলে গিয়েছে—পুতুলের মত লোক চলছে—গাড়ী চলছে। বাহবা, বাহবা ! বুড়ো বয়সের ছাতিও তার ফ্‌লে উঠল।

এইবার পলেস্তারা, নক্সা, কার্ণিস, বিট, পাতলা ছুরির মত ধারালো মিহি কর্ণির কাজ। কাগজে পেন্সিল দিয়ে ছ'কে নিতে হবে নক্সা। সাদীর কনেকে যেমন টিপ দিয়ে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সাজায়—তেমনি ক'রে সাজাবার পালা।

ভারা থেকে সে নেমে এল। শ্যামাদাসবাবুকে সেলাম ক'রে বললে—সেলাম হুজুর—দেখে লেন কাম। ইঞ্জিনীয়ার নিয়ে এসে কাম দেখে লেন।

ঠাকুরঝিকে ডেকে বললে—শুন ইদিকে।

পকেট থেকে নীল কাগজে মোড়া দু'টি সোনার কানের টাপ তার হাতে দিয়ে বললে—মতিকে দিস। আর এই লে ভাই তুর। একটি টাকাও তার হাতে দিলে।

—মতিকে ?

—হ্যাঁ। মন্দির শেষ হ'ল। বকশিশ দিলাম লাতবউকে।

—কি বলব ?

—আমি কিছু বুলব না। সি তার যা খুসী হয় করবে।

ঠাকুরঝি যেতে যেতে বললে—মরণ !

আজ মাসখানেক পরে জনাব সন্ধ্যায় হুকায় তামাক খেতে খেতে ভূতুড়ে বটগাছ তলায় গিয়ে বসে। এখান থেকে মন্দিরটা দেখা যাচ্ছে, মসজিদের মিনার দেখা যাচ্ছে, বাবুদের চিলে-কোঠা দেখা যাচ্ছে। মাধববাবুর তেতলার ঘরের সারি দেখা যাচ্ছে। সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে এল। ইমারতগুলো আর দেখা যায় না। অন্ধকারের মধ্যে সাদা কিছু যেন নড়ছে জমীনের উপর। এগিয়ে আসছে।

* * * *

পলেস্তারা চলছে। হঠাৎ সেদিন জনাব এল না। শ্যামাদাসবাবু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন—কি হ'ল ?

রসিদ হেসে বললে—ভীমরথি হয়েছে বুড়ার হুজুর। খারাপ ব্যামো হয়েছে।

—খারাপ ব্যামো ? কি বিপদ ! কি ব্যামো ?

—ওই সব কামিনগুলাকে নিয়ে মাতামাতি করে হুজুর এই বুড়া বয়সে—। হাসলে রসিদ।

—রাম রাম রাম !

—কিছু ভাববেন না বাবু, আমরা কাম ঠিক বাজিয়ে দোব আপনার।

এই ব্যাধি জনাবের ছিল—প্রথম হয়েছিল বর্ধমানে। মধ্যে মধ্যে হঠাৎ দেখা দেয়। আবার নতুন করেও হয়। জনাব যায় ডাক্তারের কাছে।

ডাক্তার বলেন—কি জনাব? একটু হাসেনও সঙ্গে সঙ্গে।

জনাব সকলের সামনেই বলে—রোগের নাম; বলে—কাজকাম হাতে রয়েছে—জলদি সারিয়ে দিতে হবে। টাকা ধরে দেয় ডাক্তারের টেবিলের উপর।

আগে ইনজেকশন ছিল না। এখন ইনজেকশন উঠেছে। জনাব সব হাল হদিস জানে। সকাল থেকে কোন কিছু না-খেয়ে খালি পেটেই এসেছে। সে তার মোটা মোটা শিরাওয়ালা হাত একখানা বাড়িয়ে দেয়; কনুয়ের ভাঁজের জায়গাটায় তাকিয়ে দেখে। ওইখানটার শিরাতেই ডাক্তার স্থঁচ ফুটিয়ে দেবে। বহুত তারিফের হাত ডাক্তারবাবুর। পুট ক'রে স্থঁচটি ফুটিয়ে চালিয়ে দেবে শিরার মধ্যে। বহুৎ পাতলা হাত।

ইনজেকশন নিয়ে একটু ব'সে সে চলে যায় বাড়ী।

অদ্ভুত বাড়ী জনাবের। মাটির দেওয়ালের ভাঙা ঘর। সামনে এক পাকা বারান্দা। গোল থাম, পাকা ছাদ, পাকা মেঝে। সেই বারান্দার উপর বিছানা পেতে সে শুয়ে পড়ে। ইনজেকশনের পর জ্বর আসবে। বাড়ীতে কেউ নাই। হামিদনের মৃত্যুর পর সে আর নিকা করে নাই। ইচ্ছাই হয় নাই। কি করবে সে নিকা ক'রে? রঙ্গু, সৈরভী, হায়তন, রোশনী, টগরী বউ, সত্য ঠাকুরঝি, জুবেদা, রাণী সই, মতি নাতবউ, দাসী নাতনী—এদের নিয়ে দিন কাটছে তার, কি করবে সে নিকা ক'রে? এক হামিদন এসেছিল তার জীবনে—সেও জানটাকে দিয়ে গেল গোনাহগারির মাশুল। আবার নিকা? নিকা ক'রে সে মানুষটাকে কষ্ট দিয়ে কাজ কি? ওদের তো সে ছাড়তে পারবে না! সে জানে। অহরহ কাজ-কামের সময় যারা পাশে থাকে, হাতে হাত লাগে, চোখে চোখ রাখতে হয়, পায়ে ইঁট পড়লে আহা বলে, যাদের মাথার চুল মুখে এসে

পড়ে ঝুঁকে ইঁট মসলা দেবার সময়, ভারার উপর কড়া রোদে মাথা ঘুরে গেলে যারা বাতাস দেয় আঁচল দিয়ে, তাদের উপর দিল না পড়ে উপায় কি ? এমন কোন রাজমিস্ত্রী সে তো দেখলে না—যে এদের দিল না দিয়ে পারলে ! তবু তারা বিয়ে করে। করুক—জনাব করে নাই।

সে জানে খোদাতায়লার দরবারে এটা তার 'গোনাহ'। তার এই পাপ—'জেনার' জন্য গোনাহের গোনাগারী তাকে দিতে হবে। দুনিয়ার মানুষকে সে দেখছে। ভালমানুষ আছে বইকি। এই দুনিয়ায় পয়গম্বর আসেন—ইমানদার মানুষ আছেন—তাইতো দুনিয়া আজও আছে। নইলে দুনিয়া ফেটে চৌচির হয়ে যেত মানুষের পাপে। ওঁরা বাদে বিলকুল মানুষ সুদ খাচ্ছে—ঘুষ নিচ্ছে, চুরি করছে—জেনা ব্যভিচার করছে। সে সুদ খায় না; ঘুষ নেয় না; চুরি করে না। দস্তুরী অবশ্য নিয়ে থাকে—সে মালিকে জানে—ঘুষ আর চুরি জানিয়ে করা হয় না। দস্তুরী দস্তুরী—সে তার পাওনা। সেও তার গোনাহ নয়। এক গোনাহ এই। সেই পাপের ভার আর বিয়ে করে সে বাড়াতে চায় না। স্ত্রী বর্তমানে এই অন্যায় আরও গোনাহ।

সে বলে—আল্লাহ্ তায়লা—খোদা তায়লা—মহম্মদ রসুল আল্লাহ্ ! আমার এই গোনাহটুকু মাফ্ কিয়া যায় হজরৎ !

অনেকক্ষণ পর সে আবার বলে—যদি গোনাহগারি দিতে হয়—মাফ যদি নাই কর—সাজা দিয়ো তুমি।

জ্বরের ঘোর কমে আসে; জনাব উঠে বসে। দুটো ইনজেকশনেই জনাব তাজা হয়ে ওঠে। বাইরে থেকে রোগের লক্ষণ আর কিছু নাই। বাবরী চুল আঁচড়ে গামছায় মুখ মুছে ফতুয়া গায়ে দিয়ে চটী পায়ে সে এসে দাঁড়ালো মন্দিরের কাছে।

বুড়ো হয়েছে জনাব। রাগ যেন চট ক'রে হয়ে যায়। রসিকদকে সে সজোরে এক চড় মেরে বসল। বেইমান কোথাকার ! সয়তান কোথাকার !

রসিদ হতভম্ব হয়ে গেল। তারপর রুখে উঠল।

জনাব গর্জে উঠল—চিল্লাস না—ইখানে চিল্লাস না। গর্দানা ধরে নিকাল দিব। ইখানে চিল্লাস না। তুর বাপ স্থদি কারবার করে—আমি টাকা ধারি না, তুর বাপের অনেক জমীন আছে– আমি কৃষাণ নই। তু ওই মতির সর্বনাশ করেছিস—নিজের বেমার উকে দিছিস। তুর নিজের জোয়ানী বয়েস, বেমার ধরিয়ে চিকিৎসা করাচ্ছিস না। তোবা, তোবা। হারামী, হারামী তুই। নিকাল হামারা হিয়াসে!

রসিদ তার যন্ত্রপাতি নিয়ে চলে গেল।

জনাব মতির কাছে এসে দাঁড়ালো। মতি ভয়ে কাঁপছিল। জনাব একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বললে—যা তুকে আর কিছু বুলব না। তুদের জাতটাই এমনি।

ছুটির সময় বললে—ডাক্তারকে আমি বুলে রেখেছি। যাস। ডাক্তার ফুঁড়ে ওষুদ দিয়ে দেবে। জর আসবে—ইখানে শুয়ে থাকবি। ছুটি হলে বাড়ী যাবি। এই কাচা বয়েস—এখন থেকে ঘুন ধরাস না শরীলে।

আব্দুল বললে যাবার সময়—রসিদকে মেরে ভাল কর নাই ওস্তাদ। ওর বাপ—।

জনাব হা-হা করে হাসলে।—কি করবে আমার?

রসিদ এবং রসিদের বাপ কিছু করতে পারত কি না ঠিক পরখ হ'ল না। মাস দুয়েকের মধ্যে মন্দির শেষ হ'তেই জনাব চলে গেল এখান থেকে।

এ জেলার পাশেই জেলা সাঁওতাল পরগণা। সেখানে সাহেবান পাদরী বাবালোক—বড় আড্ডা করেছে। সাঁওতালদের কেরেস্তান ধর্ম দিয়েছে। লেংটার বদলে পাতলুন পরিয়েছে, মেয়েরা ঘাঘরা পরে, বাবুলোকের মেয়েদের মত ভাল ভাল শাড়ী পরে, জামা পরে, খোপা বাঁধে, লেখাপড়া শেখে। সেখানে এক বড় ভারী গির্জা হবে। বড় বড় খিলান—বহুৎ উচু চূড়া ক্রমশ সরু হয়ে উঠে মিশে যাবে ছুঁচালো হয়ে। খিলান—গোল খিলান নয়—ঠিক

ইস্কাপনের মাথার মত না হলেও—ঐ ধরণের মাথাটা হবে—একটি বাহারের কোণ তৈরী করে মিলবে।

জনাবকে খবর দিয়েছে তারই এক জানা ঠিকাদার। জনাবের খিলানের পাকা হাত সে জানে।

মতিবালা খবরটা শুনে কাঁদলে।

জনাব বললে—যাবি আমার সঙ্গে?

মতি চুপ ক'রে রইল। যেতে সে পারবে না।

জনাব নিজেই বললে—নাঃ। যেয়ে কাজ নাই তোর। ঘর থেকে পা বার করলে তোরা আর থামবি না। ভাগবি আমাকে ফেলে কারুর সঙ্গে। তা ছাড়া—মরেই যদি যাই আমি তো—তোর কি হবে?

একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললে—আমি রসিদকে বলে যাব। ওই তোকে দেখবে, বুঝলি। হেসে আবারও বললে—আমি জানি তুর মনের আসল টানটা রসিদের উপর।

রসিদকে ডেকে বললে—গোসা রাখিস না ভাই। আমি চল্লাম। দেখিস—তু মতিকে দেখিস, মেয়েটা-ভাল।

গ্রাম থেকে বেরিয়ে একবার সে দাঁড়াল। পিছন ফিরে দেখলে। ওই মন্দির—মন্দিরের উপরের পঙ্কের পালিস বকের পালকের মত ঝলমল করছে—মাথার উপর পিতলের কলস ঝকমক করছে। ওই মসজিদের দক্ষিণ দিকের মিনার।

আবার সে ফিরল। সাঁওতাল পরগণায় লালমাটির টিলা, সেই টিলার উপর সাহেবানদের গির্জা হবে। চাঁপার কলির মত গোল ক্রমশঃ সরু স্থচালো হয়ে উঠবে গির্জার চূড়া।

* * * *

শ্যামাদাসবাবুর মন্দির এবং জনাব নিয়ে গল্প শেষ হয়েছে। কিন্তু জনাবের কথা শেষ হয় নাই। সামান্য কয়েকটা কথা।

তিন বৎসর পর। জনাবের শেষ দশা। হয়তো আট-দশটা দিন কি

দু-একটা মাস—কিম্বা মাত্র কয়েক ঘণ্টাও হতে পারে। সাঁওতাল পরগণা থেকে দুরারোগ্য ব্যাধি নিয়ে সে ফিরে এসেছে। অনেক ব্যাধি—তার মধ্যে পেটের অসুখটাই প্রধান। জীর্ণ শরীর, দেখলে চেনা যায় না, বাবরী চুল আছে, কিন্তু তার অধিকাংশই উঠে গিয়েছে। নাকের হাড়টা খাঁড়ার মত উঁচু হয়ে উঠেছে; মোটা হাড়গুলি সার হয়েছে, হাতের আঙ্গুল ঠক ঠক ক'রে কাঁপে। জনাব তবু সেই জনাব। ফিরে এল—সঙ্গে এক ওখানকার সাঁওতাল মেয়ে। বোধ হয় কেরেস্তান। ঘাঘরা না পরলেও—বেশ কায়দা ক'রে কাপড় পরে, চুল বাধে চমৎকার ছাঁদে। সাধারণ সাঁওতাল মেয়ের মত নয়! পুরানো লোকে বললে—তাজ্জব। একেবারে সেই রঙ্গুর মতো দেখতে।

মাসখানেক পর সে দিন—জনাব বসেছিল—সেই বুড়া বটতলায়।

তাব বাড়ী তিন বৎসর না ছাওয়ানোতে ভেঙ্গে পড়ারই কথা। কিন্তু একেবারে ভেঙ্গে সেখানে নতুন ঘর হয়েছে। জমিদারের বাকী খাজনার নালিশের নীলামে রসিদ আলির বাপ সেটা কিনে পুরানো ঘর ভেঙ্গে নতুন ঘর তুলেছে। রসিদ এখন ঠিকাদারী সুরু করেছে; তার চূণ, সিমেণ্ট আরও মালপত্র সেখানে থাকে। মতিবালা সেখানে বাঁধা কামিন এখন।

জনাব প্রথম দুটো দিন আব্দুলের বাড়ীর দাওয়াতে ছিল। দ্বিতীয় দিন রাত্রে দাওয়ার আশেপাশে লোক ঘুরতে দেখলে জনাব। সাঁওতাল মেয়েটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে। জনাব তাকে আগলে জেগে বসে রইল। সকালে উঠে বাজারের ভিতর গিয়ে একটা ঘর ভাড়া করলে; হাজার হলেও বাজার, এখান থেকে একটা মানুষকে জোর ক'রে তুলে কেউ নিয়ে যেতে পারবে না। জোরের কিন্তু দরকার হ'ল না; দিন বিশেক পরে মেয়েটাই চলে গেল—রসিদের আড়তে নয়—তার বাড়ীতে—রসিদ তাকে কলমা পরিয়ে নিকা করবে।

জনাব আব্দলকে বললে—দুটো ক'রে রান্না ভাত আমাকে দিবি? পয়সা আমি দোব।

আব্দুল বললে—তুমি ওস্তাদ। তুমার কাছে কাম শিখেছি। এ আমার ভাগ্যি। তুমি এইখানেই থাক। তবে পয়সা আমি লিব না।

খুসী হ'ল জনাব। আল্লাহতয়লার তুনিয়া রসুলে আল্লা-হজরত মহম্মদ এসে দিয়ে গেলেন; কোরান সরিফ, এসব কি বরবাদ হতে পারে? ইমানদার মানুষ আছে বৈকি। সে বললে—বেশ তবে আমি মরে গেলে নিবি। আমাকে ওই বটতলায় একটা ছোট ঘর—চালা ঘর বানিয়ে দে। ওখানেই আমি থাকব।

—সে কি?

—হাঁ। চোখের উপর আমি দেখতে পারব না আব্দুল। তার চেয়ে নিরালায় বেশ থাকব আমি।

সে কিছুতেই তার গোঁ ছাড়লে না।

একটা চালাঘর।

সামনে কতকগুলা ইঁট। জনাব বলে মেঝেটা বাঁধিয়ে নেব। তারই কতকগুলা সে বিছিয়ে নিয়েছে বটতলায়, সেইখানে বসে থাকে।

আষাঢ় মাস। ঘনঘটায় মেঘ করে এসেছে, আকাশ যেন ভেঙ্গে পড়ছে। বৃষ্টি আসবে। জনাব উঠতে চেষ্টা করলে—পারলে না। আবার সে বসল। ওই চালা ঘরে গিয়েই বা কি হবে; এ জল আটকাবে না। জোর হাওয়া দিলে হয়তো ভেঙ্গে চাপাই দেবে। আব্দুলের দাওয়াতে গেলেই বা কি হ'ত? ঝাপটায় ভিজতে হ'ত। নিজের ঘর থাকলেও—ভাঙা চাল—দেওয়ালের ফাটলের ভিতর দিয়ে জল আসত। এ নয় তার চেয়ে কিছু বেশী।

ঘন কালো মেঘ। কালো রং মিশানো সিমেণ্ট করা মেঝের মত বাহার খুলেছে। বাহবা! বাহবা! ও কি মন্দিরটা নয়? কালো আকাশের গায়ে সোণার বরণ কলস—কয়েকটা দানাবাঁধা বিজলীর মত ঝকমক করছে, তার নিচে পঙ্কের পলেস্তারা করা তুধবরণ মন্দিরের মাথা! আহা-হা-হা! চোখ ফেরালে সে। আকাশ জোড়া কালো মেঘের পালিশের গায়ে হলুদবরণ

ঘরে মাধববাবুর তেতলার ঘরের সারি। সোণার বরণ বহুড়ীরা জানালা ধ'রে দাঁড়িয়ে মেঘ দেখছে। নিচের তলায় বৈঠকখানা ঘরে বাবুরা মজলিশ ক'রে বসে গরম চা খাচ্ছে। বাচ্চারা সব বারান্দায় ছুটাছুটি করছে। তার হাতে গড়া—তার হাতে গড়া ছাদ। কোন ভয় নাই, যত জোরে আসুক বৃষ্টি, এক ফোঁটা গলে পড়বে না। আনন্দ রহো, আরাম করো। আরও একটু দৃষ্টি ফিরিয়েই—ওই আর এক টুকরো দালান—কার চিলে কোঠা—কালো মেঘের গায়ে ভাসা বাড়ীর মত মনে হচ্ছে। কবুতরেরা, কাকেরা, পেঁচারা আলসের নিচের খোপে খোপে গিয়ে ঢুকেছে; গলা ফুলিয়ে চুপ ক'রে সব ব'সে আছে। এ খোপ রাজ মিস্ত্রীরাই রাখে। থাকুন সুখে আরামে মৌজ ক'রে মালিকরা ঘরের অন্দরে, পাখীরা থাকবে খোপরে-খোপরে। থাক, তোরা আরামসে থাক। খোদাতায়লার কাছে কলকল ক'রে বলিস--জনাব আলির জেনার গোনাহ যেন মাফ করেন। আর কোন গোনাহ তার নাই। আবার দৃষ্টি ফেরালে সে, এদিকে কোন কিছু দেখা যায় না। শুধু মেঘ - শুধু মেঘ। বাহারে! চমৎকার মেঘ তো এ দিকটার! সাদায় কালোয় যেন ভাঙা গড়া চলছে লহমায় লহমায়। ওই দিকটা দিয়েই সে সাঁওতাল পরগণা গিয়েছিল। বাঃ, সাদা মেঘ ঠিক যেন গির্জার চূড়া হয়ে উঠেছে। চাঁপার কলির মত গোল মিনার ক্রমশঃ সরু সুঁচালো হয়ে মিশে গিয়েছে। দুনিয়ার সব দুঃখ সে ভুলে গেল। দৃষ্টি ফেরালে সে আবার।

আঃ—ওই যে মসজিদ—ওই যে তাব হাতে গড়া মিনার!

ঝপ ঝপ ক'রে বৃষ্টি নেমে আসছে।

আসুক।

জনাব তাকালে মাথার উপরে—বুড়া বটগাছের পাতায় পাতায় ঢাকা গোল গম্বুজের মত মাথার দিকে। খোদাতায়লার নিজের হাতে গড়া ইমারৎ।

সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে—এইটুকু ছাড়া।

নারী

ডাক্তারখানার সামনে একখানা ট্যাক্সী এসে দাঁড়াল। শব্দ ক'রে ধোঁয়া ছেড়ে বন্ধ হয়ে গেল ইঞ্জিন।

ডাক্তার প্রেসক্রপশন লিখতে লিখতে মুখ তুললেন। ওই ইঞ্জিন বন্ধ করার শব্দেই ডাক্তার বুঝলেন ডাক্তারখানাতেই কেউ এল মোটরে ক'রে। যুদ্ধের বাজারে পেট্রোল র‍্যাশন এবং মোটরের দুষ্প্রাপ্যতায় মোটর এসে থামলে ঔৎসুক্য একটু হয় বৈ কি! বিশেষজ্ঞ বড় বড় ডাক্তার যাঁরা—বত্রিশ-চৌষট্টি-একশো যাঁদের ফি—তাঁদের দরজার কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু মাঝারি খ্যাতিসম্পন্ন ডাক্তার—আট টাকা যাঁর বাড়ীতে ফিস্ এ বাজারে যাঁরা মোটরে চ'ড়ে আসেন, তাঁর দরজায় না এসে তাঁকে তো তাঁরা বাড়ীতেই ডাকতে পারেন। আরও একটু বিস্মিত হলেন ডাক্তার, একা একটি মেয়ে নামছে। ডাক্তার পর মুহূর্তেই আবার চোখ নামিয়ে প্রেসক্রপশন লিখতে আরম্ভ করলেন। ডাক্তারের কাছে লোকের যাওয়া আসার ভঙ্গিটা বিচিত্র। এবং রোগ বিশেষতঃ রোগীর বিষয়ে ডাক্তারদের মন প্রায় নির্বাণের কোঠা-বাড়ীর সিঁড়ির মাথায় এসে পৌঁছেচে। বিস্ময়ও নাই, ঔৎসুক্যও নাই। রোগী আসে, ডাক্তার দেখেন—টেম্পারেচার, হার্ট, লাংস, জিভ, পেট; কয়েকটা প্রশ্ন করেন, প্রেসক্রপশন লেখেন, কি খাবে বলে দেন। তার পর আর একজনকে বলেন, আপনার কি ?

আড়ষ্ট মুখে বোল টেনে লোকটি বলে, অসহ্য বেদনা।

—বেদনা তো বটে। কোথায় ?

লোকটি মুখ উঁচু ক'রে সামনের একটি মাত্র দাঁতের কাছে আঙুল নিয়ে গিয়ে বলে—ডাঁ-ট।

গোটা বর্গ টাই উচ্চারণ করতে গেলে দাঁতের সঙ্গে জিভের স্পর্শ প্রয়োজন। তাই জিভকে তালু পর্য্যন্ত এনে সন্তর্পণে দ কে ড এবং ত কে ট বলে কাজ সারেন। ডাক্তার বলেন, ডেন্টিষ্টের কাছে যান। তার পর বলেন, নাড়ুন তো আঙুলে ক'রে দেখি।

আঙুল দিয়ে দাঁত নাড়তে নাড়তে ভদ্রলোক 'হুঁ-হুঁ' ক'রে ওঠেন।

ডাক্তার বলেন—প্রফুল্ল, দাঁত-তোলা যন্ত্রটা দাও তো?

শিউরে ওঠেন ভদ্রলোক —না-না।

—তবে এলেন কেন আমার কাছে?

—একটু কোকেন।

— দিচ্ছি। হাঁ করুন। আর একটু হ্যাঁ—। এমন ক'রে হাত দেবেন না। হাত সরান! ব্যস্ হয়ে গেছে। জল দিয়ে কুল্লু করুন। দাঁতটা ফেলে দিন ধরুন। এই তুমারা কেয়া? আ?

—পেটমে বহুত দরদ। পা'খানা যাচ্ছে বাবু। জ্বরভি হইয়েছে—

হুঁ। দেখি? উতারো—গায়ের কাপড়া উতারো। পেট টিপে দেখেন, হাত দেখেন।—পা'খানার সময় পেট কামড়ায়? আম আছে?

—হাঁ বাবু।

—রক্ত আছে?

—হাঁ বাবু। তাজা রক্ত নিকলাচ্ছে।

—কতবার পা'খানা গিয়েছ?

—দশ-বারো দফে। একটু ভেবে আবার বলে,—বেশী হোবে বাবু।

হুঁ। ডাক্তার প্রেসক্রুপশন লেখেন।—খুব সাবধান থাকবে। খারাপ বেমার। ব্যাসিলারী ডিসেন্ট্রী! শক্ত জিনিস কিছু মৎ খাও। ছানার জল, বার্লি, ডাবের জল এই খাবে। আপনার?

ভদ্রলোক বলেন—সেই যে পরশু আমার মেয়েকে নিয়ে এসেছিলাম। কমলা।

—কোন্ মেয়েটি বলুন তো ?

—আমার মেয়ে।

—হ্যাঁ। কোন্ মেয়েটি ? বয়স কত ? অসুখ কি ?

—কমলা বলে মেয়েটি। পনের-ষোল বছর বয়স। বুকে বেদনা জ্বর।

—ও। হুগলী থেকে অসুখ নিয়ে এসেছে।

—হ্যাঁ।

—কি খবর ? কেমন আছে ?

—কমেনি কিছু। জ্বরটা একটু বেশী হয়েছিল। বরং।

—হুঁ ! কই এনেছেন ?

—না। বলেন তো ওবেলা আনব।

—আনবেন। প্লুরুসি হয়েছে আপনার মেয়ের। ভাল চিকিৎসার দরকার। ক্যালসিয়াম ইনজেকশন দিতে হবে। না হ'লে ভবিষ্যতে খারাপ হ'তে পারে।

—খারাপ হ'তে পারে ?

—হ্যাঁ। টি-বি-তে দাঁড়াতে পারে।

ভদ্রলোক স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

ডাক্তার আর একজনকে বলেন—আপনার ?

—আমার বাড়ীতে একবার যেতে হবে।

—বারোটার পর। ঠিকানা রেখে যান কম্পাউণ্ডারের কাছে। এই তোর কি রে ? এ্যাঁ ? তোর তো সেই সাতখানা রোগ। ওষুদ খাচ্ছিস্ ? কই দেখি, আয়।

এ পাড়ারই একজন দরিদ্র রুগ্ন ব্যক্তি।

—আর মদ খাচ্ছিস্ ?

—আজ্ঞে না।

ডাক্তার চোখের পাতা টেনে দেখলেন। লিভার টিপলেন।—লাগে?

বেশ কাতর মুখভঙ্গি ক'রেও লোকটি বললে—আজ্ঞে, আগের চেয়ে কম।

—হুঁ! ওষুদ নিয়ে যা। মদ খেলে কিন্তু বাঁচবি না তুই।

প্রেসক্রপশন লিখতে বসলেন ডাক্তার। ঠিক এই সময়ে ট্যাক্সীটা এসে দাঁড়াল। ডাক্তার একবার চোখ তুলে দেখলেন। একটি মেয়ে নামল—একা। বিস্ময়ে মুহূর্তের জন্য ডাক্তারের ললাটে প্রশ্নের ক'টি রেখা জেগে উঠল। তার পরই তিনি আবার প্রেসক্রপশনে মন দিলেন।

মেয়েটি এসে পরিচিতের মত সপ্রতিভভাবে—মেয়েদের জন্য নির্দিষ্ট কাঠের পার্টিসন দিয়ে ঘেরা ঘরটির মধ্যে ঢুকে বসল। অল্পবয়সী লম্বা গড়নের মেয়েটির আবির্ভাবে রোগীর দলও একটু উৎসুক; এমন কি খানিকটা প্রফুল্ল হয়ে উঠল যেন। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ীর রঙের প্রতিচ্ছটার আভায় তাদের চোখে যেন প্রসন্নতা এনে দিলে খানিকটা।

ডাক্তার আর একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার?

সে বললে—ভদ্রমহিলাটিকে দেখে নিন আগে। ট্যাক্সীটা দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ডাক্তার বললেন—সেই ভাল।

চেম্বারে ঢুকে ডাক্তার বললেন—আপনার কি?

মেয়েটি হাসলে। ডাক্তার বিস্মিত হলেন। মেয়েটির হাসির জন্যে নয়। মুখখানা অত্যন্ত পরিচিত বলে মনে হচ্ছে। মেয়েটির সুন্দর মুখে দুই গালে ঠিক এক জায়গায় দুটি প্রায় সমান আকারের তিল। অত্যন্ত চেনা।

মেয়েটি বললে—রোগী দেখা শেষ করুন। আমার খানিকটা সময় লাগবে।

ডাক্তার সবিস্ময়ে মেয়েটির দিকে চেয়েই দাঁড়িয়ে ছিলেন।

মেয়েটি বললে—চিনতে পারছেন আমাকে?

—ঠিক মনে হচ্ছে না। আপনি—

—আমি আপনি নয়। আমি তুমি। যান রোগীদের বিদায় করুন।

ডাক্তার অত্যন্ত বিস্মিত হয়ে বেরিয়ে এলেন। কে? কে? কে?

—আমার হাতটা দেখুন ডাক্তারবাবু।

চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ডাক্তার তার দিকে চাইলেন—কি তোমার? হাতখানা ধরলেন। কে? উঁহু। তা কি হয়।

* * * *

মেয়েটি হেসে বললে—চিনতে পারলেন না আমাকে?

—আপনি—তুমি কে বল তো?

—দেখেই চিনতে যখন পারলেন না, তখন নাম বললে মনে পড়বে?

—মনে হচ্ছে এক জনের কথা। কিন্তু সে কেমন ক'রে হবে? সে তো—

মেয়েটি উঠে ডাক্তারকে প্রণাম ক'রে বললে—বুঝতে পারছি আপনি চিনতে পেরেছেন। আমিই সেই।

—নির্মলা? তুমি—?

তাঁর কথা কেড়ে নিয়ে নির্মলা হেসে বললে—তুমি বাঁচলে কি ক'রে? সশব্দে সে হেসে উঠল; তার পর বলল—আমি বেঁচেছি, নিউমোথোরাক্স ক'রে বেঁচে উঠেছি। যাদবপুরে চৌদ্দ মাস বিছানায় পড়ে ছিলাম। উঠতে দেয়নি। বাঁচার সে এক যন্ত্রণা। সে আবার হেসে উঠল।

ডাক্তরের মুখ প্রসন্ন হাসিতে ভরে উঠল। বাঃ। ভারী আনন্দ হ'ল তোমাকে দেখে। চমৎকার চেহারা হয়েছে তোমার? আর কোন কমপ্লেন নাই তোমার?

—আপনি দেখুন।

ডাক্তার সযত্নে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন।—নাঃ কিছু না। তবু একটা এক্সরে ফটো নিয়ো।

আঁচলের ভিতর থেকে বড় একখানা খাম বার ক'রে মেয়েটি দিলে।—নিয়েছি দেখুন। মাথার ঘোমটা ঈষৎ বাড়িয়ে দিয়ে সে হাসতে লাগল।

ফটোখানা দেখতে দেখতে ডাক্তার বললেন—যাদবপুরেই বেড পেয়েছিলে তা হ'লে?

—হ্যাঁ পেয়েছিলাম। একটু হেসে সে আবার বললে, ফ্রি বেড নয়, পেয়িং বেড।

—পেয়িং বেড! ডাক্তার বিস্মিত না হয়ে পারলেন না।—সে তো—

আবার সে ডাক্তারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললে—সে তো অনেক খরচ! আবার হাসলে মেয়েটি। আবার বললে—ট্যাক্সী ক'রে এসেছি দেখছেন না?

আমার বেশভূষা—গয়না দেখে বুঝতে পারছেন না আমার সে-দিন আর নাই!

ডাক্তার একটু অপ্রতিভের মত বললেন—হ্যাঁ—হ্যাঁ। ভারী আনন্দ হ'ল, ভারী খুসী হয়েছি আমি। কিন্তু—ডাক্তার একটু থামলেন। তার পর আবার বললেন—রমেন তো এখন সেই ফ্যাক্টরীতে চাকরী করছে, তাকে দেখে তো মনে হয় না টাকাকড়ি করেছে যথেষ্ট।

মেয়েটি বললে—ডাক্তার বাবু, লোকে বলে—স্ত্রীলোকের চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য দেবতাতেও বুঝতে পারে না। আমি তো স্ত্রীলোকের চরিত্রে দুর্বোধ্য কিছু দেখি না? স্ত্রীলোকের ভাগ্য বুঝাই কঠিন। পুরুষেরা কাজ ক'রে তার ফল পায়, আমরা ভাগ্যফলেই পুরুষের হাতে পড়ি। বুঝা কঠিন পুরুষের চরিত্র।

ডাক্তার চুপ ক'রে রইলেন একটু। তার পর বললেন—ভারী খুসী হয়েছি তোমাকে দেখে। আচ্ছা, তা হ'লে আজ এসো। আমার আবার বাইরে কল রয়েছে কতকগুলো।

মেয়েটি বললে—বেশ লোক আপনি। আমার রোগের চিকিৎসার কথা কিছু হ'ল না, আর বলছেন তুমি এস!

—আবার কি রোগ তোমার?

মেয়েটি একখানা কাগজ বার ক'রে ডাক্তারের হাতে দিলে। একটি ক্লিনিকের রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট। রোগিণী নির্মলা দেবী। রক্তে উপদংশ বিষ রয়েছে। পরিমাণ—আট দশ।

নির্মলা বললে—আমি এখন—। একটু থামলে। তার পর মৃদু হেসে অকম্পিত স্বরে বললে—আমি এখন—। একটু থেমে বললে—এখন আমি বেশ্যা ডাক্তার বাবু।

অতর্কিতে অল্প-একটু ধাক্কা খাওয়ার মত একটা অনুভূতি অনুভব না ক'রে ডাক্তার পারলেন না। নির্মলা আপনার বাঁ হাতখানি প্রসারিত ক'রে নিজের চোখের সামনে ধরলে, ডান হাত দিয়ে এ হাতের কনুয়ের ভিতর দিকে সুগৌর-সুডোল হাতের নীল শিরার উপর হাত বুলিয়ে বললে—ইনজেকশন নিয়ে নিয়ে শিরাগুলো সব বসে গেছে।

ডাক্তার ইনজেকশন দিয়ে থাকেন বাঁ হাতে। অবহেলা ক'রে বা অবলীলাক্রমে দিচ্ছেন এটা প্রমাণ করার জন্য নয়, ওটাই তাঁর অভ্যাস। তবে লোকে মনে করে তাই। ইনজেকশনে এমন নিপুণ হাত খুব কম দেখা যায়। প্রায় চোখের পলকে বললে অত্যুক্তি হয় সামান্যই। ডাক্তার সিরিঞ্জের নিড্‌ল বের ক'রে দিলেন। এক টুকরো বেনজুইন ভিজানো তুলা বসিয়ে দিলেন। হেসে বললেন—ব্যস। একটু ব'সে থাক।

ডাক্তার বেরিয়ে এলেন।

ভিতর থেকে নির্মলা ডাকলে—ডাক্তার বাবু!

—কি? অসুস্থ বোধ করছ?

—না

—তবে? ডাক্তার ভিতরে এলেন।

—আপনার ফি। মেয়েটি দুখানি নোট তুলে দিলে।

একখানি নোট ফেরত দিয়ে ডাক্তার হেসে বললেন—এতেই হবে। এই-বার উঠতে পার তুমি। গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে তোমার।

—থাক। মেয়েটি উঠে দাঁড়াল।—একটা কথা।

—বল।

—একটু ড্রিঙ্ক করতে পাব?

—ড্রিঙ্ক ? ডাক্তার অবাক্ হয়ে চেয়ে রইলেন নির্মলার দিকে মুহূর্তের জন্য। পর মুহূর্তেই নিজেকে সংযত করলেন তিনি—বললেন—না।

—আমার হ্যাবিট হয়ে গেছে। তা' ছাড়া; সে হেসে বললে—পুরুষ চরিত্র রহস্যময়—উনি আবার ড্রিঙ্ক না করলে খুসী হন না।

ডাক্তার একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—না। ও এখন বন্ধ রাখতে হবে।

একটি নমস্কার ক'রে নির্মলা বেরিয়ে গেল।

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন নিজের অজ্ঞাতসারেই।

নির্মলা অসঙ্কোচে বললে—আমি—। আমি এখন—। অবলীলাক্রমে বললে—ড্রিঙ্ক করা আমার হ্যাবিট হয়ে গেছে। * অসঙ্কোচে—অবলীলাক্রমে। * পরক্ষণেই সব ঝেড়ে ফেলে তিনি * বেরিয়ে পড়লেন। 'কল' আছে। টি-বি পেশেণ্ট প্রভাকে ক্যালসিয়াম দিতে হবে। ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়ার পেশেণ্টটাকে কুইনিন। টাইফয়েড তিনটে কেস। একটা সিগারেট ধরিয়ে গাড়ীতে উঠলেন।

* * * *

মানুষ বিচিত্র। ডাক্তার ভাবছিলেন সেই কথা সন্ধ্যার সময়।

সন্ধ্যাতেও ডাক্তারখানায় রোগী আসে, কিন্তু সংখ্যায় কম; দু'চার জন। ডাক্তার সন্ধ্যাতে কোট-পেণ্টালুন পরেন না। ধূতি-পাঞ্জাবী প'রে চেম্বারে বসে থাকেন; দু'একটা সিগারেট খান, কখনও সখ হ'লে গড়গড়ায় তামাকও খান। রোগীদের বিদায় ক'রে বই পড়েন। মনোবিজ্ঞানে ডাক্তারের বেশী ঝোঁক। সাইকোলজির বই বেশী পড়েন। চিকিৎসাতেও সাহায্য হয়। এক বন্ধুর স্ত্রী সম্প্রতি মধ্যে মধ্যে দুরন্ত বেদনা অনুভব করেছেন বুকে, বেদনা উঠলেই ডাক্তার তাকে এ্যাকোয়া অর্থাৎ শুধু জল ইনজেকশন দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভদ্রমহিলা সুস্থ হয়ে উঠে বসেন। এক বিন্দু বেদনা থাকে না। ডাক্তারের ধারণা রোগে যারা ক্রমাগত ভোগে তাদের শতকরা ষাটজনেরও বেশী সংখ্যক লোকের ব্যাধিই মনের ব্যাধি। একটি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে

এইমাত্র বিদায় হ'ল; ছেলেটি প্রায় রোজ সন্ধ্যায় আসে, গল্প ক'রে চলে যায়। সপ্তাহে একবারও অন্ততঃ হৃদ্‌যন্ত্রটি পরীক্ষা করায়; ওর ধারণা ওর হার্টের দুর্বলতা আছে, যে কোন মুহূর্তে তা থেকে কঠিন বিপদ হতে পারে; সেই-জন্য ভদ্রলোক বিবাহ পর্য্যন্ত করলেন না। এবং বুঝিয়েও ডাক্তার ওকে বিশ্বাস করাতে পারলেন না। ডাক্তারের কাছে গল্প করতে আসাটা ওর গল্পের আকর্ষণ নয়, আসল ব্যাপার হ'ল ডাক্তারের সান্নিধ্য লাভ ক'রে খানিকটা আশ্বাস লাভ করা। এতেই যেন তার ডাক্তার দেখান হয়ে যায়। লোকটি চ'লে যেতেই ডাক্তার হাতের বইখানা খুলে বসলেন। শক্তিশালী লেখকের লেখা ভাল বই। সামারসেট মমের ভক্ত তিনি, মমের বই রেজারস এও। কয়েক মুহূর্ত পরে মুখ তুলে রাস্তার দিকে অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রইলেন। রাস্তায় লোকজন অবিরাম চলছে—জনস্রোত। এই দিকেই গঙ্গার ঘাটে যাওয়ার পথ। লোকে ইলিশ মাছ হাতে নিয়ে আসছে ঘাট থেকে; পুণ্যলোভী মেয়েরা অনেকে এই রাত্রেও গঙ্গাস্নান করে আসছে। বোধ হয় কোন পার্বণ আছে আজ। সেজে-গুজে অনেক মেয়ে গঙ্গার ধারে হাওয়া খেয়েও ফিরছে। দু'-চারটি চতুরা দেহব্যবসায়িনীও সঞ্চরমান শিখার মত অনুসারী পতঙ্গ পিছনে নিয়ে আসছে—সামনেই একটা গলি—সেই গলিতে ঢুকে যাচ্ছে। ঢুকবার সময় এদের একটা বিশেষ ভঙ্গিতে পিছনে ফিরে চাওয়ার অভ্যাস আছে। যেন ঝাপটা মেরে চকিতে ফিরে পিছনের দিকে চেয়ে দেখে নেয়;—বোধ হয়—অনুসরণকারীকে দেখেও নেয়—এবং অভয় দিয়ে আহ্বানও জানায়।

মনে প'ড়ে গেল নির্মলাকে। তার কথাগুলো কানের কাছে বেজে উঠল যেন। আমি এখন—আমি এখন বেশ্যা ডাক্তার বাবু।

সেই মেয়ে। সুদীর্ঘ আট মাস ধ'রে তিনি তার চিকিৎসা করছিলেন, একদিন কথা মাত্র বলেছিল। একদিন মাত্র।

এক একটা কেস ডাক্তারের অদ্ভুত ভাবে মনে থাকে।

বিচিত্র ধরণের রোগ, বিচিত্র ধরণের রোগী, বিচিত্র ধরণের রোগীর বাড়ী—এগুলো মনে রেখাপাত করাই স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে তার কোনটাই এমন কিছু বিচিত্র ছিল না। শুধু রোগিণী ওই নির্মলা মেয়েটির মধ্যে ছিল শান্ত ভাবের এবং সহনশীলতার মাত্রাতিরিক্ততার—কি বলব?—বৈচিত্র্য, হ্যাঁ বৈচিত্র্য বলাই ভাল; ডাক্তার মধ্যে মধ্যে বিস্মিত হতেন, মনে মনে প্রশংসা করতেন।

বৎসর তিনেক হবে। যুদ্ধের প্রথম অবস্থা সেটা। ১৯৪১ সাল। মনে আছে ডাক্তারের তিন বৎসর আগে, সকালে এল একজন অল্পবয়সী ভদ্রলোক। সুদর্শন চেহারার একটি তরুণ, পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের বেশী বয়স হবে না। রোগীর ভিড় রয়েছে। সে টেবিলের ওপাশটা ধ'রে দাঁড়িয়ে বললে—ডাক্তার বাবু, আপনাকে একবার আমাদের বাড়ী আসতে হবে।

ডাক্তার তার মুখের দিকে তাকালেন—ভদ্রলোকের মুখে-চোখে উদ্বেগের আকুলতা দেখতে পেলেন।

ডাক্তার কিছু বলবার আগেই সে আবার বললে, এখুনি আসতে হবে একবার দয়া ক'রে। খুব আরজেণ্ট।

—কি কেস? আরজেণ্ট বলছেন? কেসটা কি?

—একটি মেয়ের অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে। মেয়েটি প্রেগনেণ্ট। ফার্ষ্ট প্রেগনেন্সি।

—প্রেগনেণ্ট! যন্ত্রণা কোথায় হচ্ছে?

—পেটে।

—আমি জিজ্ঞাসা করছি—যন্ত্রণাটা কি ডেলিভারী—

—না—না—ডাক্তার বাবু। সে সময় নয় এখন, তা ছাড়া সে যন্ত্রণাও নয়।

—তা হ'লে একটু বসুন। এঁদের কয়েক জনকে দেখে যাব।

জোড়হাত ক'রে সে বললে—না। খুব যন্ত্রণা হচ্ছে। একবার এখুনি আসতে হবে আপনাকে। চোখ তার ছল-ছল ক'রে উঠল।

ডাক্তার আর না বলতে পারলেন না। উঠলেন। সেই নিজে নিলে কল-বাক্সটা।

বস্তীর মধ্যে। দরিদ্র ভদ্র গৃহস্থের বস্তী। ডাক্তার হাসলেন। বাসীন্দারাই ভদ্র এবং গৃহস্থ। বস্তী কিন্তু বস্তী। খোলার চাল, ছিটেবেড়ার দেওয়াল, সরু স্যাঁতসেঁতে গলি-পথ, মাছি-মশা-দুর্গন্ধ সবই আছে। একখানি ঘর আর সামনে একটু ক'রে বারান্দা নিয়ে এক একটি সংসার, ময়লা হাফ-প্যাণ্ট-পরা অপরিচ্ছন্ন ছেলের দল, কেউ কাশছে, কেউ কাঁদছে, কেউ মুড়ি খাচ্ছে; সঙ্কীর্ণ লম্বা মেটে উঠানে কাক এসে নেমেছে, একজন সৌখীন ব্যক্তির একটা লোমওয়ালা কুকুর ঘেউ ঘেউ করছে কাকগুলোকে দেখে; উঠানের এক পাশে ঘেরা দেওয়া একটা স্নান করবার এবং বাসন মাজবার জায়গা, তার মধ্যে সনাতন পাতকুয়া—কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি সংক্রামক রোগের ইনকিউবেটার; এসে জমে ওইখানে—মুহূর্তে মুহূর্তে বাড়ে। ওরা ভোগে মরে। তবু অদ্ভুত এদের জীবনের সহ্য শক্তি। বৈজ্ঞানিক মতে ওদের মরে যাওয়া উচিত—তবু ওরা বেঁচে আছে ওই সহ্য শক্তির জোরে।

তবু বস্তীটা ওরই মধ্যে ভাল। বারান্দা মেঝে সিমেণ্ট করা, সিমেণ্টের সঙ্গে লাল রং মিশিয়ে বস্তী বাসীন্দাদের যাদের কিছুখানি গোপন সৌখীন রুচি আছে—তাদের সেই রুচিকে আকর্ষণ করার চেষ্টা আছে বস্তীর মালিকের। পলকা-হালকা কাঠের সেই সনাতন দরজা—তবু তাতে সবুজ রং ধরানো হয়েছিল প্রথমে। জানালাগুলিও একটু আকারে বড়। দেড় ফুট চওড়া, আড়াই ফুট লম্বা হবে মাপে। কতকগুলো শিক—কতকগুলোয় কাঠ দেওয়া, কেউ কেউ জানালায় পর্দা দিয়েছে। এর দরজাতেও একটা পর্দা ঝুলছিল। কারও দুটি অল্পবয়সী ভদ্রলোক বসেছিল।

ভিতরে একখানা তক্তপোষের উপর শুয়েছিল মেয়েটি। সাদা সায়া-ব্লাউসের

উপরে একখানি পরিচ্ছন্ন ধুতি ছিল পরণে, হাতে ছিল ছুগাছি রুলি, দেখলেই বুঝতে পারা যায় মেয়েটি বিধবা। মুখ ঘোমটায় ঢাকাই ছিল—তবু সে আরও একটু টেনে দিলে ঘোমটা। তার পর স্তব্ধ হয়ে পড়ে রইল। সে স্তব্ধতা সে শান্ত সহনশীলতা ডাক্তারের ভারী ভাল লেগেছিল। ধপ্ধপে বিছানায় পরিচ্ছন্ন শুভ্র পরিচ্ছদে আবৃত মেয়েটির যন্ত্রণার মধ্যেও সেই শান্ত সম্বৃত স্তব্ধ অবস্থার কথা আজ স্মরণ ক'রে ডাক্তারের মনে হ'ল সে অবস্থার সঙ্গে রাত্রের নদীর রূপের অনেকটা মিল আছে—তুলনা চলে বোধ হয়। ডাক্তার অনেক দিন রাত্রে এগারটা-বারোটার সময় গঙ্গার ধারে বেড়ান। নদীর যে নিজস্ব তরঙ্গক্ষুব্ধ গতিশীল রূপ দিন রাত্রির মধ্যে তার সত্যকার কোন অবস্থান্তর কি রূপান্তর ঘটে না; কিন্তু মানুষের চোখে রাত্রির অস্পষ্টতার মধ্যে তার রূপের পরিবর্তন ঘটে—তখন নদীর তরঙ্গক্ষুব্ধ গতি চোখে দেখা যায় না—মনে হয় শান্ত শুভ্র সুদীর্ঘ জলধারা নিথর হয়ে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে! মধ্যে মধ্যে মৃদু আলোড়নে আবর্ত উঠে এখানে ওখানে সেখানে এক-একটা। মেয়েটির অঙ্গ সেদিন মধ্যে মধ্যে যন্ত্রণার আধিক্যে এক একবার অবাধ্য আক্ষেপে জেগে উঠছিল। কুঁকড়ে কুঁকরে উঠছিল মেয়েটি। আবার নিজেকে সংযত ক'রে শান্ত স্থির হয়ে শুচ্ছিল।

—কি যন্ত্রণা হচ্ছে আপনার? কোথায় যন্ত্রণা হচ্ছে?

মেয়েটি শান্ত হাতখানি রাখলে লিভারের কাছটায়। ডাক্তার দেখলেন। জ্বরও একটু হয়েছে। ডাক্তারের মনে হ'ল, পাকস্থলী এবং মলস্থলীর মধ্যে গণ্ডগোল কিছু হয়েছে। প্রশ্ন করলেন—কোষ্ঠ পরিষ্কারের কথা।

মেয়েটি ঘাড় নাড়লে। 'না' বললে এটা বুঝা গেল। ডাক্তার প্রশ্ন করলেন—ক'দিন পরিষ্কার হয় নি?

ভদ্রলোকটি এবার মেয়েটির মুখের কাছে তার কান নিয়ে গেল। মেয়েটির ঠোঁট ছুটি ঈষৎ নড়ল।. ভদ্রলোকটি বললে—তিন চার দিন চলছে।

ডাক্তার বললেন—এ অবস্থায় পারগেটিভ ত' চলবে না। ডুস দিতে হবে। ডুস্ দিন, কমে যাবে বেদনা। আর একটা ওষুদও দেব।

চিন্তিত মুখে ছেলেটি বললে—ডুস্ দিতে তো জানি না ডাক্তার বাবু।

হেসে ডাক্তার বললেন—কঠিন কিছু নয়, আপনি ডুসটা নিয়ে আসবেন, আমি বুঝিয়ে দেব। আপনি লেখাপড়া জানেন। দেখিয়ে বুঝিয়ে দিলেই পারবেন।

না ডাক্তার বাবু, এমনিই আমি নার্ভাস হয়ে পড়েছি। আমি—। সে আর কিছু বলতে পারলে না।

ডাক্তার বুঝলেন, ভদ্রলোক অতিমাত্রায় বিচলিত হয়ে পড়ছেন। তিনি বললেন—তা হ'লে আমার কম্পাউণ্ডারকে আনতে পারেন; সে দিয়ে দেবে। সে একস্পার্ট লোক। একটা টাকা দিয়ে দেবেন তাকে।

একটু চুপ করে থেকে সে বললে—মেয়ে ছেলে—কম্পাণ্ডার বাবু পুরুষ মানুষ—!

অন্য যারা বসেছিল দাওয়ায় তাদের একজন এবার ভেতরে এসে বললে—একজন নার্স আনলেই তো হয়!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। কাছাকাছি নার্স কোথায় পাওয়া যাবে ডাক্তার বাবু?

ডাক্তার বললেন—আসুন আমি চিঠি দিয়ে দেব একখানা। এই তো বড় রাস্তায় চৌমাথাটার উপরেই একটা নার্সের আড্ডা আছে।

আজ ডাক্তার সে কথা মনে ক'রে একটু হাসলেন। সেদিন কিন্তু হাসেন নাই। মন তাঁর খুসীতে ভ'রে উঠেছিল। রোগী দেখতে গিয়ে সর্ব প্রথম তাঁর চোখে পড়ে রোগীর পরিবারের মনোভাব। কোথাও দেখা যায় রোগীর প্রতি ঘরের মানুষের নিদারুণ উদাসীনতা; অবহেলিত অবজ্ঞাত রোগী প'ড়ে থাকে, মাথার গোড়ায় এক গ্লাস জল কোথাও থাকে, কোথাও তাও থাকে না।

কোথাও কোথাও এই নিষ্করুণ অবহেলা এমন নিষ্ঠুর ভাবে আত্মপ্রকাশ করতে দেখেছেন ডাক্তার যে, আজও তা মনে অক্ষয় হয়ে আছে তাঁর ; ভাবলেও শিউরে ওঠেন তিনি। চাকরদের ক্ষেত্রে অবশ্য এমন প্রায়ই ঘটে। ডাক্তার সেগুলো ধরেনই না। আত্মীয়-স্বজন আপনার জনের বেলায় এই অবহেলা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় বিধবা মেয়েদের রোগশয্যায়। আবার দেখা যায় রোগীর জন্য সমগ্র পরিবারের সে কি ব্যাকুলতা। সকল স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের জন্য প্রতিটি মানুষ ব্যগ্রতায় সস্নেহ চোখে চেয়ে আছে রোগীর মুখের দিকে। তারা যেন সকল কষ্ট--সকল উপসর্গ—সকল রোগ আপনাদের হাত দিয়ে বুক দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে মুছে নিতে চায়। অবশ্য অবৈতনিক মনোভাবের জন্য অনেক ক্ষেত্রে তারা গণ্ডগোল ঘটায়। তবুও এমন ক্ষেত্রে তাঁর চিকিৎসকের মনও প্রসন্ন হয়ে ওঠে। বর্তমান ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভাব থাকলেও এদের সে অভাব বোধ সম্বন্ধে সচেতনতা ছিল। ছেলেটির নার্স আনার প্রস্তাবে অত্যন্ত খুসী হয়েছিলেন তিনি।

ছেলেটি তার সঙ্গে আসতে আসতে বলেছিল--কিছু কি কঠিন দেখলেন ডাক্তার বাবু?

—না-না-না। ড্রুস দিলেই সেরে যাবে, সামান্য ব্যাপার।

গাঢ়কণ্ঠে ছেলেটি বলেছিল—আমি ছাড়া ওর আর কেউ নাই ডাক্তার বাবু। বিধবা মেয়ে—ওই একটা সন্তান হয়ে যদি বাঁচে তবে জীবনে হয় তো সুখী হবে।

একটা মেয়ে হয়েছিল নির্মলার।

ডাক্তারের মুখে বিচিত্র হাসি দেখা দিল

ডাক্তার বাবু।—

ডাক্তারের চিন্তাসূত্র ছিন্ন হ'ল। হাতে 'মমের' বইখানা খোলাই আছে। বইখানা রেখে তিনি একটু নড়ে চড়ে বসলেন। একটি প্রৌঢ়া মেয়ে একটি অবগুণ্ঠনবতী মেয়েকে নিয়ে এসেছে। এরাও বস্তীর বাসীন্দা। ডাক্তারের জীবনে

ডাক্তার যত রোগী দেখলেন—তার মধ্যে বস্তীর বাসীন্দাই বোধ হয় শতকরা সোত্তর-পঁচাত্তর জন। এদিক্‌টায় একটা প্রকাণ্ড অঞ্চল জুড়ে বস্তী। মেয়েদের নিয়ে যারা আসে—তারা প্রায় রাত্রেই আসে।

—কি ?

—একে একবার দেখুন বাবা! বড় ভুগছে। কুচো-কাঁচা ভাঁড় খুরির মত চারটি ছেলেপুলে। এই-এই-এই-একটি কোলে। তার ওপরে এই রোগ।

চেম্বারে ঢুকে ডাক্তার টেনে নামালেন ওপরের ঝোলানো জোরালো আলোটা। রক্তহীন পাংশু একখানি কচি মুখ, চোখের পাতায় অপার্থিব অবসন্নতা ঘনিয়ে রয়েছে মেঘাচ্ছন্ন বর্ষা অপরাহ্নের মত। ডাক্তার তাঁর ব্যবসায়-সুলভ নিরাসক্তির সঙ্গে তাকে দেখতে চেষ্টা করলেন। পরীক্ষার অবশ্য প্রয়োজন ছিল না, চোখের দৃষ্টিতেই তিনি দেখতে পাচ্ছেন নিষ্ঠুর নিষ্করুণ ক্রূর ক্ষয় রোগ—যক্ষ্মা। দারিদ্র্যের আচ্ছাদন তলে অবরুদ্ধ অন্ধকারে তার বাস। রোগ মাত্রেই নিষ্করুণ। তবু সকল রোগের মধ্যে এই রোগটি ক্রূর এবং নিষ্ঠুর। তিলে তিলে হত্যা করে। তিনি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাকে পরীক্ষা করলেন। চমকে উঠলেন তিনি। রোগের ধরণটা ঠিক নির্মলার মত ড্রাই প্লুরিসি থেকে যক্ষ্মায় পরিণতি লাভ করছে। একটা দিক যেন ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছে।

নির্মলার কথা মনে করতে করতে ডাক্তার খানিকটা ভাবাবেগে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন; নিজের ব্যবসায়-সুলভ নিরাসক্তিকে কিছুতেই সজাগ ক'রে তুলতে পারলেন না। চোখে তাঁর জল এসে গেল।

সঙ্গিনী প্রৌঢ়া বললে—ডাক্তার বাবু!

দ্রুত চিন্তার স্রোত বয়ে গেল ডাক্তারের মনের মধ্যে।

দরিদ্র গৃহস্থঘরের বধূ; চারটে সন্তানের জননী। বাঁচতে হয় তো পারে নিউমোথোরাক্‌স্ করলে। নির্মলা বেঁচেছে। আজকের দু' বৎসর সওয়া দু' বৎসর আগে যেদিন তিনি শেষবার নির্মলাকে দেখেছিলেন—

এর অবস্থা প্রায় তেমনি—হয় তো কিছু ভাল। নির্মলা বেঁচেছে। এও বাঁচতে পারে সে চিকিৎসায়।

আজ সকালবেলায় নির্মলার মুখ মনে পড়ল—সজীব লাবণ্যে ঝলমল করছে। এক্সরের ফটোটা চোখের সামনে ভেসে উঠল।

ডাক্তার শিউরে উঠলেন সঙ্গে সঙ্গে।

কানের পাশে বেজে উঠল—আমি—। আমি এখন—! আবার বেজে উঠল—ড্রিঙ্ক—একটু—ওটা আমার হ্যাবিট হয়ে গিয়েছে।

প্রৌঢ়া মেয়েটি আবার বললে—ডাক্তার বাবু!

ডাক্তার বেরিয়ে এসে বললেন—এ আমার অসাধ্য বাপু। যক্ষা।

মেয়েটি একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—সে বুঝেছি ডাক্তার বাবু। কিন্তু কোন উপায়—

ডাক্তার বললেন—হাসপাতালে অনেক—অনেক খরচ। উপায় আমার জানা নেই বাপু!

* * * *

ঠিক নির্মলার মত রোগের ধরণটা। অদ্ভুত সাদৃশ্য আছে। প্রথম দিন ধরতে পারেননি ডাক্তার। মেয়েটিও যন্ত্রণার সঠিক স্থান নির্দেশ করতে পারে নাই। রাত্রেই আবার সেই ছেলেটি এল। অপরিসীম উদ্বেগ ছিল তার মুখে। ডাক্তার বাবু!

—কি? ও—আপনার বাড়ীতেই তো সকালে গিয়েছিলেম আজ। ডুস্ দেওয়া হয়েছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু যন্ত্রণা তো কমল না ডাক্তার বাবু।

—কমেনি? সে কি? ডাক্তার একটু চিন্তিত হলেন।

—একবার চলুন আপনি। যন্ত্রণাটা উপর দিকে উঠছে বলছে।

কেরোসিন তখনও এমন দুষ্প্রাপ্য হয় নাই। একটি বেশ সৌখীন উজ্জ্বল আলোই জ্বলছিল। দিনের আলো সত্য রূপ ধরিয়ে দেয়, রাত্রে যত উজ্জ্বল

আলোই হোক, সে যেন রূপের উপর একটা উজ্জ্বল সূক্ষ্ম আস্তরণ টেনে দিয়ে তাকে বেশী সুন্দর করে দেখায়। রাত্রের নদীর উপর জ্যেৎস্না এবং পাতলা কুয়াসা পড়েছিল বলে মনে হয়। তেমনি ধপধপে পরিচ্ছন্ন মহিমায় আবৃত হয়ে – তেমনি নিথর ভাবেই পড়েছিল। এখন সে দেখালে ব্যথাটা বগলের প্রায় নিচেই। জ্বর বেশ একটু হয়েছে।

ডাক্তার ধীরভাবে পরীক্ষা করলেন, অনেক্ষণ ধ'রে পরীক্ষা করলেন। প্লুরিসি ধরা পড়ল এবার।

—ডাক্তার বাবু!

ডাক্তার বললেন—প্লুরিসি হয়েছে। ভাল চিকিৎসার প্রয়োজন। ক্যাল-সিয়াম ইন্‌জেকশন দিতে হবে। ভাল খাদ্যের প্রয়োজন।

– যা দরকার হয় করুন আপনি। বলুন কি পথ্য দিতে হবে। আজ থেকেই আরম্ভ করুন ইনজেকশন।

প্রায় সমারোহ করেই চিকিৎসা সুরু হ'ল।

ডাক্তার যেতেন। মাথার গোড়ায় টেবিলে দেখতেন ফল সাজানো রয়েছে। দামী পেটেণ্ট ওষুদ। মেয়েটি স্তব্ধভাবে শুয়ে থাকত। মুখের খানিকটা দেখা যেত। একটা তিল কাল রঙের ফুলের মত ফুটে থাকত গালের উপর। দীর্ঘকাল ধরে ডাক্তারের ধারণা ছিল – গালে তিল ওর একটা। নীরবে হাতখানি বাড়িয়ে দিত। ডাক্তার রবারের নলটা টেনে বাঁধতেন বাহুর উপর। ইনজেকশন দিতেন। এতটুকু স্পন্দন কি চাঞ্চল্য দেখা যেত না।

উপকারও হ'ল। জ্বর একেবারে কমে গেল। ব্যথাটাও আর অনুভব করত না। একদিন ছেলেটি বললে – আগ কতদিন লাগবে ডাক্তার বাবু?

– চিকিৎসাটা এখন চালাতে হবে অন্ততঃ প্রসবের আগে পর্য্যন্ত।

ছেলেটি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে।

ডাক্তার বললেন – এটা একটা ট্রেচারাস ব্যাধি। বিশেষ ক'রে –

বাধা দিয়ে ছেলেটি বললে—দেখতে তো সেরে গিয়েছে বলেই মনে হয়।

—হ্যাঁ। কিন্তু ক্যালসিয়াম ইনজেকশনের এখনও দরকার আছে।

তার পর, তার পর বোধ হয় দুটো ইনজেকশন দিয়েছিলেন মনে হচ্ছে। এর পর আর ডাকলে না। শেষের দিন বলেছিল—ডেলিভারীর সময় তো এগিয়ে এসেছে ডাক্তার বাবু। ডেলিভারীটা হাসপাতালে হওয়াই ভাল, কি বলেন? আর কেউ মেয়ে-ছেলে নেই। আমি কাজে যাই।

ডাক্তার বললেন—সব চেয়ে ভাল হবে। আমি বরং হাসপাতলে একখানা চিঠি লিখে দোব।

ছেলেটির সে কি কৃতজ্ঞতা ফুটে উঠেছিল চোখের দৃষ্টিতে—আজ দেবেন? সময়ে নিয়ে রাখাই ভাল, নয়?

—আসুন।

চিঠি নিয়ে গেল। তার পর আর কোন খবর ডাক্তার পান নাই। ইনজেকশন দেবার নির্দিষ্ট দিনে ডাক্তার অপেক্ষা করেছিলেন। প্লুরিসির পিছনে ক্ষয়রোগের কঙ্কালসার তীক্ষ্ণ নখর যে হাতখানা মেয়েটির দিকে প্রসারিত হয়ে আসছিল—তাকে তিনি হাত গুটাতে বাধ্য করেছিলেন! তিনি স্পষ্ট চোখে দেখতে পেতেন—হাতখানা সঙ্কুচিত ক'রে সরিয়ে নিচ্ছে সে। দ্বন্দ্বযুদ্ধে জয়ের আনন্দ অনুভব করেন তিনি এমন ক্ষেত্রে। শুধু তাই নয়, যাকে উপলক্ষ ক'রে এ দ্বন্দ্ব বাধে এমন জয়ের ক্ষেত্রে সেই শরণাগত জনটিকে বড় ভাল লাগে। সকল ডাক্তারেরই লাগে। যে রোগীকে বাঁচায় তাকে যেন মনে হয় পরম স্নেহাস্পদ পরম প্রিয়জন। এ মেয়েটিকে আরও ভাল লাগত। শুভ্র পরিচ্ছদ-মহিমায় স্নিগ্ধ, সহনশীল মেয়েটি জ্যোৎস্না রাত্রের নিথর নদীর মত—নীরব—শান্ত; ক্রূর ক্রোধী ক্ষয়ের শোষণ-গণ্ডুষ থেকে তিনিই রক্ষা করেছেন। ক্ষয়ের শোষণ-গণ্ডুষ শিথিল হয়ে গিয়েছে, সে বয়ে চলেছে নিরুদ্বেগে কোমল মৃত্তিকার বুক বেয়ে।

কয়েক দিনই মনে হয়েছিল তার কথা। একবার ভেবেছিলেন খোঁজ করবেন। কিন্তু কর্মব্যস্ত জীবন। অভিশপ্ত পরাধীন দেশের রোগজর্জ্জরিত

মানুষের মধ্যে এ অবকাশ ঘটে নাই তাঁর। ডাক্তারের একটা কথা মনে পড়ে লজ্জা হ'ল। যেদিন তিনি খোঁজ করবেন ঠিক করেছিলেন, সে দিন প্রায় সেই সময়েই এসেছিল—ইনসিওরেন্স কোম্পানীর এজেণ্ট; চারটে কেস নিয়ে এসেছিল। অর্থ লোলুপতা ঠিক নয়; অর্থের প্রয়োজন হয়। ইনসিওরেন্স কোম্পানীর ডাক্তার তিনি। খোঁজ করা হয়ে ওঠেনি।

* * * *

ক্রমে ক্রমে ভুলেই গিয়েছিলেন প্রায়। অনুরূপ দুঃখীর রোগক্লিষ্ট জীবনের সঙ্গে নিত্য পরিচয় হয়ে চলেছে। প্রত্যেকের দুঃখ দেখে মনে হয়, এর চেয়ে দুঃখ আর কারও বেশী নয়। নিরাসক্তির বর্মের মধ্যে হৃদয়কে ঢেকে চলেন ডাক্তার।

মাস দুয়েক পর—হঠাৎ একদিন এল সেই অল্পবয়সী ভদ্রলোক। ঠিক প্রথম দিনের মত টেবিলের ওপাশ ধ'রে দাঁড়াল। মনে হ'ল তেমনি উদ্বেগে কাতর। ডাক্তার তাকে দেখবামাত্র চিনলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনের চোখে ভেসে উঠল—ধপধপে বিছানায় শুয়ে আছে পরিচ্ছন্ন শুভ্র পরিচ্ছদ-পরিহিত একটি শান্ত স্তব্ধ মেয়ে। ডাক্তার প্রশ্ন করলেন—কি খবর মশাই?

—একবার যেতে হবে ডাক্তার বাবু।

—কেন? মেয়েটি আছে কেমন?

—ভাল নাই। দিন বিশেক হ'ল ডেলিভারী হয়েছে। আবার সেই কমপ্লেন। এবার জ্বরও বেশী, ব্যথাও বেশী।

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। কারণ, কার্য, ফল—সবই তিনি বুঝতে পারলেন। বললেন—দিন বিশেক ডেলিভারী হয়েছে? তা' ডেলিভারীর আগে হঠাৎ চিকিৎসাটা বন্ধ করলেন কেন?

মাথা নিচু ক'রে ছেলেটি টেবিলের কোণটা নখ দিয়ে খুঁটতে আরম্ভ করলে। একটু পর বললে—বেশ সেরে উঠল। দুটো তিনটে ইন্‌জেকশনের দিন চলে গেল—দেখলাম ভালই রয়েছে। ভাবলাম সেরে গেছে। কথাটার

মধ্যে অসমাপ্তির রেশ রয়ে গেল, সে চুপ ক'রে গেল। অপরাধ স্বীকারের এটা একটা ভঙ্গি।

ডাক্তার বললেন—বড় অন্যায় করেছেন। আমি তো বলেছিলাম আপনাদের। বার বার ক'রে বলেছিলাম। একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন—আপনার আগ্রহ দেখে আমি খুব আশা করেছিলাম।

ছেলেটি এবার উপরের দিকে মুখ তুলে উপরের দিকে চেয়ে রইল।

ডাক্তার বললেন—চলুন দেখি।

দেখলেন ডাক্তার।

সেই মেয়ে—সেই ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। কোলের কাছে একটী শিশুকন্যা। শীর্ণ কঙ্কালসার শিশু; মরণোন্মুখ গাছের ফুলের মত। ডাক্তার এবার দেখলেন—পারিপার্শ্বিকও পাল্টে গিয়েছে। চারিদিক্ মালিন্যে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। বিছানা ময়লা, মেয়েটির কাপড় জীর্ণ, ঘরে একটা গন্ধ হয়েছে।

মেয়েটির জ্বর অনেকটা। বুকের ভিতরটাও জীর্ণ হয়েছে।

ডাক্তার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। একটা ইনজেকশনও দিলেন। তারপর বললেন—চলুন। একটা খাবার ওষুদও নিয়ে আসবেন। ঘর থেকে বার হ'বার সময় একবার ফিরে চেয়ে দেখলেন। পারিপার্শ্বিক পাল্টেছে—মেয়েটিও যেন ঈষৎ পাল্টেছে। আরও শান্ত হয়ে গিয়েছে মেয়েটি। রাত্রের নদীতে মধ্যে মধ্যে যে একটা-দুটো আবর্তের আভা পাওয়া যায়, তেমনি ভাবে এক আধবারও মেয়েটির দেহে যন্ত্রণার আক্ষেপ আগে দেখা যেত। এখন আর তাও দেখা যায় না।

ছেলেটির নাম ডাক্তার সেইদিন জেনেছিলেন। রমেন ছেলেটির নাম। কায়স্থ। ছেলেটি হঠাৎ পথে ডাক্তারকে বললে—ডাক্তার বাবু, আমি যে বড় বিপদে পড়লাম।

—হ্যাঁ, বিপদ বৈ কি!

একটু চুপ ক'রে থেকে সে অকস্মাৎ বললে—মেয়েটি আমার সত্যিকারের কেউ নয় ডাক্তারবাবু।

চমকে উঠলেন ডাক্তার।—কেউ নয়?

—না।

বস্তী অঞ্চলের পথ। সেই পথে চলতে চলতে সে বললে—ডাক্তার শুনে গেলেন।—একটি ভুলের জন্য আমার এই বিপদ্। ও আমার কেউ নয়।

মেয়েটি পনের-ষোল বৎসর বয়সে বিধবা হয়েছিল। ছেলেটির বাপ তাকে দেশ থেকে এনেছিলেন রুগ্না স্ত্রীর সাহায্য করতে। ছেলেটির বাপ মধ্যবিত্ত অবস্থার চাকুরে। ছেলেটি চাকরী করে ফ্যাক্টরীতে, নাম রমেন। সে বিবাহ করে নি। বাড়ীতে রুগ্না মা ছাড়া আর কোন মেয়ে-ছেলে নাই। ওই মেয়েটিই ছিল তাদের সংসারের সব। বড় ভাল মেয়ে। শান্ত-স্বভাবা, মিষ্ট কথা, স্নিগ্ধ দৃষ্টি। বড় ভাল লেগেছিল রমেনের।

তারপর—। রমেন চুপ করলে। ডাক্তার কোন প্রশ্ন করলেন না। রাস্তাটা ছিল প্রায় জনহীন, দু' একজন লোক যারা চলছিল—তাদের খালি পা, ডাক্তার এবং রমেনের জুতোর শব্দ বেজে বেজে চলছিল।

একটু পর রমেন বললে—তার পর যা হবার হ'ল। মেয়েটি সন্তান-সম্ভবা হ'ল। উপায়ান্তর না পেয়ে ওকে লুকিয়ে এনে এখানে রাখলাম। আমি অবশ্য বাড়ীতে রইলাম—এখনও আছি। বাড়ীতে জানলে—ওই কোথায় চ'লে গেছে। আমি ওকে এখানে রাখলাম, সন্ধ্যেয় আসতাম, দশটায়-এগারটায় বাড়ী যেতাম। ইচ্ছে ছিল—যখন আমা হতেই ওর এই অবস্থা—তখন আজীবন ওকে রাখব আমি। সন্তান হ'লে—তাকেও প্রতিপালন করব। না-হয় বিয়ে-থাওয়া করব না আমি।

আবার সে চুপ করলে। আবার শুধু বাজতে লাগল জুতোর শব্দ। কিছুক্ষণ পর রমেন পুনরায় আরম্ভ করলে—কিন্তু এতটা ভাবতে পারিনি। একটা দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে বললে—ওভার টাইম খেটেও আর পারছি না।

• ডাক্তারখানায় এসে পড়েছিলেন। উজ্জ্বল আলোয় ডাক্তার দেখলেন, রমেনের চোয়াল দুটো উঁচু হ'য়ে উঠেছে। পরগাছা চড়ালে কাঁচা গাছ যেমন আড়ষ্ট হয়ে যায়, তেমনি অবস্থা হয়েছে রমেনের।

*　　*　　*　　*

এর পর সচরাচর যা হয়ে থাকে তাই।

রমেনের ক্লান্তি ক্রমশঃ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠতে লাগল। ডাক্তার বললেন, ফিস্ লাগবে না আপনার। করবারও বিশেষ কিছু নাই। দু' একটা গোল্ড ইনজেকশন দিয়ে দেখব। অনেক সময় এতে উপকার হয়।

কিছুই হ'ল না তাতে। রোগ অব্যাহত গতিতে ছুটতে লাগল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা – শান্ত সহনশীল মেয়েটির সহনশীলতা তবুও ভাঙল না।

রমেন যেন ক্রমশঃ অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠল। ডাক্তারও পীড়া বোধ করলেন। সেদিন এসে সে বললে – ডাক্তারবাবু, একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে।

চমকে উঠলেন ডাক্তার।

রমেন বললে-- মেয়েটা তো মরবেই। বোধ হয় আজ রাত্রেই মরবে। সে রাত্রে অপেনাকে কোথায় পাব ?

মেয়েটা—অবশ্য নির্মলা নয়, শিশু-কন্যাটি। শিশুটাও শুকিয়ে আসছিল—তার উপর হয়েছিল জ্বর। বাঁচবে না এ কথা ডাক্তারই বলে এসেছেন। কিন্তু তবু তিনি চমকে উঠলেন। বিরক্ত হয়ে উঠলেন। শঙ্কিত হলেন। সন্দিগ্ধও হলেন। রমেনের চোখে মরিয়া মানুষের দৃষ্টি ফুটে উঠেছে। তিনি রূঢ়স্বরে বললেন – না।

মেয়েটা মরল দু'দিন পরে। দিনেই মরেছিল।

তার পর একদিন রমেন এল—তার নিজের ব্যাধি হয়েছে। যৌন ব্যাধি। নিজে ইনজেকশন নিয়ে বলে গেল—আমি তো কাজে যাব ডাক্তার বাবু। আপনি যদি দয়া ক'রে—দেখে আসেন ; দু'দিন থেকে আরও বেড়েছে। ছটফট করছে যেন।

ডাক্তার গেলেন।

মেয়েটি আজ কথা কইলো। কিন্তু কন্যাটি যেদিন মরেছিল—সেদিনও ডাক্তার গিয়েছিলেন। মেয়েটি তেমনি ভাবে প'ড়েছিল। নিথর নিস্তব্ধ। মজা নদীর মত অবস্থা হয়েছে যেন তার। মালিন্যে সর্বাঙ্গ মলিন, মজা নদীর পঙ্কিল জলের মত। জীর্ণ-শীর্ণ-স্তব্ধস্রোতা শুকিয়ে আসছে।

হঠাৎ মেয়েটি উঠল। ডাক্তার শঙ্কিত হয়ে বললেন—উঠো না, উঠো না। শুনলে না। ডাক্তারের পা দুটো জড়িয়ে ধ'রে কেঁদে বললে—ডাক্তার বাবু, কেন আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন? আমার বেঁচে কি লাভ? আমারই লাভ, না সংসারের কোন লাভ? বুঝতে পারছেন না—ওই লোকটা কত কষ্ট পাচ্ছে? তার চেয়ে এমন কোন ইনজেকশন থাকে তো আমায় দিন—যাতে আমি দু-একদিনে আস্তে আস্তে মরে যাই!

ডাক্তার বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। তবু তিনি আত্মসম্বরণ ক'রে বললেন—একথা আমাকে অন্যায় বলছ তুমি। আমি ডাক্তার। রোগীকে বাঁচানো আমার ধর্ম। মারতে তো আমি পারি না। না—না, সে আমি পারি না।

তবু মেয়েটি পা ছাড়ে না।

ডাক্তার বহু কষ্টে মুক্ত করলেন নিজেকে। মেয়েটি বললে—লোকটা কি হ'য়ে গেছে দেখছেন না? ও বড় ভাল ছেলে ছিল ডাক্তার বাবু! আমিই ওর কাল হয়েছিলাম। একটু চুপ ক'রে–বিচিত্র হাসি হেসে বললে–বিয়ে করলে না আমার জন্যে। আমার এই অবস্থা! খারাপ ব্যারাম ধরিয়েছে—

ডাক্তার বেরিয়ে চ'লে এলেন।

সে বারের মত তিনি সেই দেখেছিলেন নির্মলাকে। মুখে না বললেও মনে মনে বলেছিলেন—

আর বেশী দুঃখ তোমায় পেতে হবে না। আর বড় জোর দু'তিনটে মাস। হয় তো তারও কম।

তার পর—আর কেউ ডাকতে আসে নাই। খবর দেয় নাই। রমেনও আসে নাই। তিনি জানতেন মজা নদী শুকিয়ে গিয়েছে।

সেই মেয়ে হঠাৎ ফিরে এল। এসে সে বললে—আমি—। ডাক্তার শিউরে উঠলেন।

* * * *

ক'দিন পর। ইনজেকশন নেবার নির্দিষ্ট দিনে এল না নির্মলা। ডাক্তার তাকে প্রত্যাশা করেছিলেন। না আসায় ক্ষুব্ধ হলেন। রাত্রে ব'সে বই হাতে সে দিনের মত ওই মেয়েটার কথাই ভাবছিলেন। মোটর এসে দাঁড়াল। ডাক্তার টেবিলের উপর ঝুঁকে প'ড়ে দেখলেন—রাস্তার দিকে তাকিয়ে—নির্মলা নামছে। আজ গাড়ীখানা 'প্রাইভেট কার'—ঘরের গাড়ী।

নিপুণ প্রসাধন-মার্জিত রূপে লাবণ্যে বেশভূষায় ঝলমল ক'রে সপ্রতিভ হাসি মুখে এসে দাঁড়াল সে—উজ্জ্বল আলোর সামনে।—সকালবেলায় আসতে পারিনি। উনি আজ শিলং গেলেন—আমাকে জবরদস্তি তোমাকেও যেতে হবে। বেলা দেড়টা পর্য্যন্ত। তার পর খালাস।

ডাক্তার বললেন—কিন্তু রাত্রে এলে কেন? খালি পেট ভিন্ন তো ইনজেকশন দেব না।

সে ব'সে পড়ল—সেই ঘরেই একটা চেয়ারে।—তাই তো!

—কাল সকালেই এস—কিছু না খেয়ে আসবে। তারপর হেসে তিনি বললেন—তুমি তো জান এ কথা। অন্ততঃ সেদিন তুমি তাই বলেছিলে।

নির্মলা বললে—ওঁর কাছে শুনেছিলাম। এ রোগ-এ ইনজেকশন আমার তো এই প্রথম।

ডাক্তার হঠাৎ অন্যায় প্রশ্ন ক'রে বসলেন। প্রশ্নটা ক'রে ফেলে তাঁর মনে হ'ল অন্যায় হয়ে গেল। বললেন—তুমি তো ইনজেকশন নিচ্ছ; কিন্তু তিনি ইনজেকশন নিচ্ছেন তো? সঙ্গে সঙ্গে অন্যায় বোধ জেগে উঠল। বললেন—প্রশ্নটা আমি অন্যায় করলাম। কিছু মনে ক'র না।

হাসলে নির্মলা। বললে—আমার কাছে আপনার অন্যায় হয়নি।

ডাক্তার চুপ ক'রে রইলেন। মেয়েটির কৃতজ্ঞতা-বোধ তাকে তৃপ্তি দিলে।

নির্মলাই একটু পর হেসে বললে—তাঁর অবশ্য অনেকবারই এ রোগ হয়েছে। তবে এবার তিনি ভালই আছেন।

ডাক্তার অস্বস্তি বোধ করলেন এবার। কথা কোন্ পথে চলেছে? কিন্তু সেই নির্মলা এত নির্লজ্জ হয়েছে যে, সে কি বলছে বুঝতে পারছে না।

নির্মলা বললে—কণ্ট্রাক্টার মানুষ, যুদ্ধের বাজার, দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়ান। মধ্যে মধ্যে আমাকেও লগেজের সামিল ক'রে নেন। গিয়েছিলেন আসাম। সেখানে—। কথাটা অসমাপ্ত রেখে সে বললে—ডাক্তার বাবু, লোকটি শিক্ষিত লোক, অনেক শিখিয়েছে আমাকে, অনেক জানে, কিন্তু দুর্দান্ত মাতাল। সেদিন বলেছি তো আমাকে শুদ্ধ মদ খেতে শিখিয়েছে। আমি না খেলে সে রাগ করে। মদ খেলে আর তার জ্ঞান থাকে না। সেখানে—। একটু হাসলে—তার পর বললে—সেখানে মদ খেয়ে সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে এল দু'জন বিদেশী। এসে আবার মদ খেলে—আমাকে খাওয়ালে। তারপর মদের নেশার উদারতায় আমাকে সেই দু'জনকে উপহার দিয়ে দিলে রাত্রির মত। কয়েক দিন পর—হঠাৎ ব্যাধি দেখা দিলে। বললাম, শুনে হাসলে। বললে—ও কিছু না। ইনজেকশন নিয়ে নাও।

ডাক্তারের ললাটে কুঞ্চন-রেখা ফুটে উঠল। কয়েক মুহূর্ত পরে মসৃণ হয়ে গেল আবার। মৃদু হেসে ডাক্তার বললেন—অদ্ভুত তো!

—অদ্ভুত। ডাক্তার বাবু, প্রথম দিন যেদিন তাকে দেখলাম—। নির্মলা আজও শিউরে উঠল। বললে, সেই দিন রাত্রে, যে দিন আপনার পায়ে ধ'রে কেঁদেছিলাম, সেই দিনই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম আস্তে আস্তে, রমেন রাত্রেও আসেনি। বেরিয়ে পড়লাম মরব বলে। কোথায় যাব? গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে হ'ল না। ভয়ও হ'ল। অনেক ভেবে ঠিক করেছিলাম—রাত্রি একটু

বেশী হ'লে—গঙ্গার জলে ঝাঁপিয়ে পড়ব। মরণও হবে—আর গঙ্গায় মরব। অনেক পাপ করেছি। মরবার সময় কষ্ট যাই হোক—ঠণ্ডা জলে শরীরের জ্বালাটাও অনেকটা জুড়োবে। নির্মলা থামল। চোখের দৃষ্টি তার শূন্যতায় যেন স্বপ্ন দেখছে।

—উঃ সে কি রাত্রি! আর গঙ্গার তীরের সে কি জায়গা! থম থম করছে রাত্রি।

কেউ কোথাও নাই, মধ্যে মধ্যে গঙ্গার জল কল-কল ক'রে ঘুলিয়ে উঠছে, পাক খাচ্ছে। মরতে এসে তীরে দাঁড়িয়ে ভয় হ'ল। সে কি ভয়, সর্বাঙ্গ থর-থর ক'রে কেঁপে উঠল। ব'সে পড়লাম। কিছুক্ষণ পর মনে হ'ল আমার হাত-পা সব যেন অসাড় হয়ে আসছে, হয় তো গড়াতে গড়াতে কখন গঙ্গার জলে গিয়ে পড়ব।

দুরন্ত ভয়ে সে ফিরে আসতে চাইলে। উঠে দাঁড়াতে পারলে না, হামাগুড়ি দিয়ে চলতে আরম্ভ করলে। পোর্ট রেলওয়ে লাইনে আঘাত খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত প'ড়েই রইল, তার পরই মনে হ'ল যদি রেলগাড়ী আসে, তাকে টুকরো টুকরো ক'রে দিয়ে যাবে! সে আবার উঠল। তার সর্বশরীর কাঁপছে, সে বুঝতে পারলে তার চামড়ার নিচে স্নায়ু শিরাগুলো থর-থর ক'রে স্পন্দিত হচ্ছে দুরন্ত ভয়ে। প্রাণপণ চেষ্টায় হামাগুড়ি দিয়েই সে রেল-লাইন পার হ'য়ে চিৎপুর রাস্তায় এসে পড়ল। একটু বিশ্রাম ক'রে রাস্তা এবং পোর্ট রেলের সীমানার মধ্যে যে রেলিং দেওয়া আছে তাই ধ'রে উঠে দাঁড়াল। ভাবছিল—মরতে হয় রোগেই মরবে সে তিলে তিলে। এমন ভাবে মরতে সে পারবে না। তারপর মনে হ'ল বাড়ী ফেরার কথা। কেমন ক'রে সে বাড়ী ফিরবে? এই জনহীন কলকাতার পথ। রাস্তার বড় বড় বাড়ীগুলো এই নির্জন নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে ভয়ঙ্কর হ'য়ে উঠেছে মনে হ'ল তার। আবার মনে হ'ল বাড়ীতেও সদর দরজা বন্ধ এখন, ভিতর থেকে তালা পড়েছে। সে যেন এবার রেলিংয়ে ঠেস দিয়ে এলিয়ে পড়ল। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়তে আরম্ভ করলে তার অজ্ঞাতসারেই।

একটা মোটর চ'লে গেল। খানিকটা গিয়েই থামল সেখানা। পিছিয়ে এল—এসে থামল তার পাশে। মোটর থেকে নামল একজন ফুলপ্যাণ্ট হাফসার্ট পরা লোক। টর্চের আলো তার মুখের ওপর ফেললে। নির্মলার চোখ বন্ধ হ'য়ে গেল আপনি; কিন্তু মদের গন্ধ পেলে সে; সঙ্গে সঙ্গে কানে এল জড়িত কণ্ঠস্বরের কথা। —হুঁ! বেশ তো! সঙ্গে সঙ্গে হাত ধ'রে একটু ঝাঁকি দিয়ে বললে· কে রে তুই? আবার বললে—কেয়াবাৎ রে! দুই গালে দুটো তিল! আঁকা নয় তো! নির্মলা অনুভব করলে—গালে আঙ্গুল দিয়ে ঘষলে সে। তার পর কানে এল,—না, আঁকা নয় তো।—কে রে তুই? কে তুই? এখানে এত রাত্রে? থাকিস কোথায়?

অনেক কষ্টে নির্মলা বললে—আমি মরব বলে—

হেসে উঠল লোকটা। সেই জন্যই কথা শেষ হ'ল না তার। তারপর সে তাকে টেনে নিয়ে বললে—আয়!

একটু বাধা যতটুকু শক্তি তার ছিল -দিয়েছিল সে। লোকটি ধমক দিয়ে বললে—এ্যাও! ধমক দিয়ে টেনে ঠেলে তুলে দিলে গাড়ীতে। গাড়ীটা আবার ফেরালে। খালের পোল পার হয়ে গাড়ী ছুটল। তাকে এনে তুললে একটা বাগান-বাড়ীতে। সাজান ঘর। একটা সোফার উপর ফেলে দিলে। ঘরের সব কটা আলো জেলে দিলে। নির্মলা ঘোমটা টেনে দিয়েছিল, সেটা টেনে খুলে ফেললে। কিছুক্ষণ দেখলে। ঘরের আলমারীতেই মদ ছিল—বা'র করলে, নিজে খেলে। নির্মলাকে বললে—খাবি?

নির্মলা কেঁদে উঠল। সে হাসলে। তার পর— । সেই দিনের আলোর মত আলোর মধ্যেই—।

শিউরে উঠল নির্মলা। তার পর আবার হাসলে। বললে—মদ খেলে জানোয়ার ছাড়া আর কিছু নয় সে। পশু!

স্তম্ভিত হ'য়ে গেলেন ডাক্তার।

নির্মলা বললে—ওটা তার বাগান-বাড়ী। প্রচুর টাকা করেছে। সেদিন আমাকে দশটাকার একখানা নোট দিয়ে বাগান থেকে বা'র ক'রে দিলে। আমার তখন নিরুপায় অবস্থা। কি করব? কেমন ক'রে ফিরব? কোন্ মুখেই বা ফিরব? শরীরেও তখন অসহ্য যন্ত্রণা। নির্মলা থেমে একটু হাসলে; বললে—যন্ত্রণা আমি সহ্য করতে পারি; কিন্তু হাঁটবার ক্ষমতা তো চাই। বাগানের মালীটাকেই দশ টাকার দুটো টাকা ভাগ দিয়ে বললাম—দু'টাকা তুমি নাও, বাকী টাকা থেকে আমাকে হোটেল থেকে একমুঠো ভাত এনে দাও। আর আমাকে একটু আশ্রয় দিতে হবে, আমার জ্বর, একটু সুস্থ হ'লেই চ'লে যাব। চ'লে আসতে পারি নাই। রাত্রে সে আবাব এল -আমি শুয়েছিলাম মালীর ঘরের বারান্দায়। হঠাৎ টর্চের আলো এসে পড়ল। সে এসে দাঁড়াল। মদের গন্ধ পেলাম। তার পর—।

হাসতে লাগল নির্মলা। বললে—মদ খেলেই সে জানোয়ার। বাঘে শুনেছি শীকারের মাংস পচিয়ে খায়।

একটু থেমে বললে—পরের দিন আর তাড়িয়ে দিলে না। সকালে ব'সে ব'সে শুনলে আমার কথা। তারপর ডাক্তার ডাকলে। আমি বলেছিলাম আপনার কথা। সে ঠোঁট বেঁকালে। তার পর ডাকলে একজন বড় ডাক্তারকে—টি-বি স্পেশালিষ্টকে। ডাক্তার বললে—হাসপাতালে দিয়ে নিউমা-থোরাক্স ক'রে দেখতে পারেন। সেরে যেতে পারে, একটা লাংস্ ঠিক আছে এখনও। চৌদ্দ মাস রইলাম হাসপাতালে। সে কি সমারোহ ডাক্তার বাবু! তার পর এনে রেখেছে একটা খুব ভাল ফ্ল্যাট ভাড়া ক'রে। কিন্তু এখনও সেই বাগান-বাড়ী আছে। সেখানে হৈ হৈ করতে যায় মধ্যে মধ্যে—মদ খেয়ে অনেক সময় আমাকে ভাল লাগে না। তখন খোঁজে কুৎসিৎ মেয়ে, দরিদ্র মেয়ে, রুগ্ন মেয়ে।

ডাক্তার শিউরে উঠলেন; বললেন—বল কি?

হেসে নির্মলা বললে—দেখুন না মাথার দিকে চেয়ে। চুলে তেল দেবার

হুকুম নেই। চকচকে চুল তার ভাল লাগে না। বলে কি জানেন? বলে—ভাল লাগা আর নেশা লাগা দুটো পৃথক্ জিনিষ। চক্‌চকে চুল ভাল লাগে—কিন্তু নেশা লাগে না। এই সে আজ গেল—কাল চুলে তেল মাখব। মদ খেলে—চকচকে চুল দেখলে—ঠেলে সরিয়ে দেয়।

ডাক্তা'র হাসলেন। সে হাসি যে কিসের, এবং কেন যে হাসলেন—তা তিনিও বুঝলেন না।

নির্মলা বললে—করুণা হচ্ছে আপনার?

তোমাকে স্নেহ করি, করুণা একটু হয় বৈকি।

—না, ডাক্তার বাবু। আর একটা দিক্ আছে তার। সে আমাকে পড়ার সাহায্য করে, একজন মাষ্টার রেখে দিয়েছে। গান শেখবার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছে। ভাল যখন থাকে তখন আমার গালের তিল দুটো নিয়ে খেলা করে, নাড়ে। বলে—একটা তিলের জন্যে কবি বোখরা সমরখন্দ বিকিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আমি দুটো তিল পেয়েছি।

ডাক্তার বললেন—এইবার খুসী হ'লাম। তুমি তা' হ'লে তাঁকে ভালবেসেছ?

চুপ ক'রে রইল নির্মলা।

—কি, উত্তর দিচ্ছ না যে?

নির্মলা বললে—ভাল লাগা আর ভালবাসা-বোধ আলাদা জিনিষ ডাক্তার বাবু। ভাল লাগে কিন্তু—। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—জানি না ঠিক। আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—সময় সময় সব তেতো মনে হয়। সব। সব। আবার মনে হয়—বেশ আছি। খুব ভাল আছি। এর চেয়ে ভাল আর ক'জন থাকে! অনেকের বউয়ের স্বামীও তো মদ খায়, চরিত্রহীন হয়।

মনস্তত্ত্ব-বাতিকগ্রস্ত ডাক্তার উৎসুক উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছিলেন। তাঁরও নেশা লেগেছে। একটু ঝুঁকে টেবিলের উপর কনুই রেখে বললেন—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?

—বলুন! হেসেই উত্তর দিলে নির্মলা।

—রমেনকে,—রমেনের কথা মনে হয় এখনও? তাকে—

নির্মলা ডাক্তারের মুখের কথাটা নিয়েই বললে—তাকে ভালবাসি কি না জিজ্ঞাসা করছেন? ঠোঁটে তার মৃদু হাসি ফুটে উঠল—বললে—হ্যাঁ বললে খুসী হন বোধ হয়!

ডাক্তার হেসে বললেন— কেন?

নির্মলা যা জবাব দিলে—সে শুনে ডাক্তার অবাক্ হয়ে গেলেন। সে খিল-খিল ক'রে হেসে বললে—মেয়েদের একনিষ্ঠতায় পুরুষরা সান্ত্বনা পায় ডাক্তার বাবু! মনে হয় আমাকে ভালবাসলে একনিষ্ঠ হয়েই ভালবাসবে।

ডাক্তার তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—একথা তোমায় শেখালে কে?

—এই লোকটি।

অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপ ক'রে রইলেন। মেয়েটি হঠাৎ বললে—রমেনের উপর কোন আকর্ষণ সত্যিই আমার নাই। একটু থেমে আবার বললে—তার উপর কোন ঘৃণাও নাই! বরং—। সেও আমার জন্যে অনেক করেছে—অনেক সয়েছে। রমেনের টাকা থাকলে—সেও হাসপাতালে খরচ ক'রে আমার এমনি চিকিৎসাই করাতো।

নির্মলা একটু আকস্মিক ভাবেই উঠে চ'লে গেল।

ডাক্তার চুপ ক'রে ব'সে রইলেন। কিছুক্ষণ পর ডাক্তারের মনে হ'ল—মানুষের জীবনটা তরল পদার্থ।

* * * *

এর পর ক'দিন এল নির্মলা। ইনজেকশন নিলে। তারপর আর সে এল না। ডাক্তার ভেবেছিলেন—নির্মলা এর পর তার নিজের অসুখে তাঁকেই কল দেবে। সেই লোকটিকে দেখবার একটা প্রবল ইচ্ছা ছিল ডাক্তারের। কিন্তু আর তার খবর পেলেন না।

ডাক্তার নিজের ব্যবসায় নিয়ে চলেছেন। টাইফয়েড, কলেরা, টি বি,

ইনফ্লুয়েঞ্জা—এ ছাড়া উদ্ভট—অদ্ভুত কত ব্যাধি! রোগীর পর রোগী আসে। কত মনে থাকে—কত ভুলে যান! যারা—কিছু দিন মনে থাকে—কিছু দিন পরে তাদের ভোলেন। আবার কতক জন নতুন রোগী, মনে থাকে কিছু দিন। শুধু দু'একজনের কথা কিছুতেই ভোলা যায় না।

প্রভা ব'লে জেলেদের মেয়েটিকে টি-বি থেকে বাঁচিয়েছেন। নরেন বাবুকে কলেরা থেকে বাঁচিয়েছেন। সে বাঁচা আশ্চর্য্য। তাকে মনে আছে। কালী-ঠাকুরের পূজারীকে মনে আছে। সে বেঁচেছে টাইফয়েড থেকে। নির্মলাকেও মনে হয় মধ্যে মধ্যে।

বৎসর দেড়েক পর আজ—হঠাৎ ডাক্তার একটা টেলিফোন পেলেন; একটি বড় হাসপাতাল থেকে টেলিফোন ক'রে জানালো—আপনাকে একবার আসতে হবে।

—আমাকে ? কেন ?

—একটি মেয়ে, আমাদের এখানকারই একটি নার্স—বিষ খেয়েছে, বাঁচবে না। আপনাকে, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

বিস্মিত হলেন ডাক্তার। কে ? নার্সদের অনেককেই তো জানেন—কিন্তু এ কে ? কে বিষ খেলে ? বিষ খেয়েই বা কে নার্স তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইবে ? তবুও তিনি গেলেন।

ডাক্তার অবাক্ হ'য়ে গেলেন।

ধপধপে বিছানায় শুভ্র পরিচ্ছদ আবৃত মেয়েটি পড়ে আছে। রাত্রের নদীর মত। মধ্যে মধ্যে আক্ষেপে দেহ সঙ্কুচিত করছে। যেন রাত্রের নদীতে আবর্ত উঠছে। নির্মলা শুয়ে আছে।

হাসপাতালের ডাক্তার বললেন—মাস কয়েক আগে এসে চাকরী নিয়েছিল। বললেন—অত্যন্ত হাসি-খুসি ছিল। কেন যে—। জানি না। মেয়েদের চরিত্র। কয়েক জন তরুণ ডাক্তার তো মন্ত্রাহত হয়ে গিয়েছিল ওকে নিয়ে। মেয়েটির অভ্যাস ছিল—খেলা করার। আপনি চেনেন ?

—চিনি। কিন্তু ও যে নার্স হয়েছে তা তো জানি না। এক সময় ও আমার পেশেণ্ট ছিল। টি-বি হয়েছিল।

তাই না কি?

—হ্যাঁ।

—দেখুন কি বলতে চায়? অবশ্য—। হাসলেন ডাক্তার। এ ডাক্তারও জানেন—জ্ঞান আর হবে না।

জ্ঞান আর হ'ল না। বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টি ভ্রান্ত প্রায়ই হয় না। ডাক্তার পেলেন একখানা চিঠি। তাঁকেই লিখেছিল নির্মলা। সুদীর্ঘ চিঠি। অনেক কথা। অনেক ঘটনা। হঠাৎ নির্মলার মন তিক্ত হয়ে ওঠে। সে নিষ্কৃতিই খুঁজছিল। ঠিক এমনি সময়ে কন্ট্রাক্টার ভদ্রলোককে গভর্ণমেণ্ট এ্যারেষ্ট করলেন—কয়েক লক্ষ টাকা প্রবঞ্চনা করার অভিযোগে। নির্মলা বেঁচে গেল। সে অনেক ভাবলে।

লিখেছে—আপনার সেদিনের কথা মনে হয়েছিল ডাক্তার বাবু। ভেবে দেখেছিলাম রমেনকে ভালবাসি কি না। আমার হাতে তখন অনেক টাকা। সে ভদ্রলোক—গহনায় টাকায় অনেক দিয়েছিলেন আমাকে। আমি স্বচ্ছন্দে রমেনকে নিয়ে সুখে থাকতে পারতাম। কিন্তু ঠিক বুঝেছিলাম—তাকে ভালবেসে আমি সুখী হতে পারব না। একবার ভেবেছিলাম—টাকা নিয়ে তীর্থ-ধর্ম করব। ভাল লাগেনি। একবার ভেবেছিলাম—সিনেমায় নামব। প্রায় ঠিকও ক'রে ফেলেছিলাম। তার পর সেও বাদ দিলাম। তার পর নার্সিং শিখতে ইচ্ছা হ'ল। খুব ভাল লাগল! মনে হ'ল—এই যেন—চাইছিলাম। কিছু তো চায় মানুষ জীবনে। মনে হয়েছিল—রমেনকে আশ্রয় ক'রে প্রথম যা পাইনি, এই লোককে আশ্রয় ক'রে টাকায়, গয়নায়, পড়ায়, গানে যা পাইনি—এইবার এই নার্সিংয়ের মধ্যে তাই পাব। প্রথম প্রথম মনেও তাই হ'ত। পেয়েছি। নিজের পরিশ্রমে উপার্জ্জন ক'রে তাই থেকে দিন চালাতাম। সে ভদ্রলোকের দেওয়া টাকা

ব্যাঙ্কে মজুত রেখেছিলাম। হাত দিইনি। দিতে ইচ্ছা হ'ত না। হয় তো বলবেন—নারী চায় পুরুষকে—এ ক্ষেত্রে তুমি সেই ভুল করেছিলে। না। তরুণ ডাক্তারেরা গুঞ্জন করত চারি পাশে। প্রথম বেশ ছিলাম। মনে হয়েছিল—সব পেয়েছি। তার পর ক্রমশঃ এর রঙও ফিকে হয়ে গেল। আর ভাল লাগল না। অত্যন্ত তেতো হ'তে আরম্ভ হ'ল সব। ক'দিন থেকে—রাত্রে ফের মদ খেতে শুরু করেছি। মদের সঙ্গেই বিষ-মিশিয়ে খাব। বেঁচে কি লাভ? ভাল লাগছে না। কি চেয়েছিলাম বুঝতে পারলাম না। বোধ হয়, ডাক্তার বাবু, মানুষ তা বুঝতে পারে না। হঠাৎ পেয়ে যায়। পেলে বুঝতে পারে—কি চেয়েছিল। বিষ খাবার কল্পনায় বেশ আনন্দ পাচ্ছি ডাক্তার বাবু।

পুনশ্চ—লিখেছে সে—আমার যে টাকাগুলো আছে ব্যাঙ্কে—সেগুলোর ট্রাষ্টি করেছি আপনাকে। উকীল জানাবে আপনাকে যথাসময়ে। মেয়েদের কোন কিছুতে দিয়ে দেবেন।

ডাক্তার স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইলেন।

কি চেয়েছিল নির্মলা? সংসার—সন্তান? কিন্তু কোন পুরুষের আশ্রয়ই তো তার ভাল লাগেনি?

কি চেয়েছিল? অন্য কাউকে চেয়েছিল? ডাক্তার হঠাৎ অত্যন্ত বেদনা বোধ করলেন।—হয় তো—তাঁকেই—। ভক্তি থেকে বলে তো বিজ্ঞানে—।

হঠাৎ মনে হ'ল—তাঁর কানের কাছে নির্মলা খিল-খিল ক'রে হাসছে—বলছে—পুরুষদের মনে হয়—আমাকে ভালবাসলেও—তো—।

লজ্জিত হলেন ডাক্তার।

কমলা বলে মেয়েটি—প্লুরুসির রোগী—তাকে নিয়ে এল তার বাপ।

ডাক্তার উঠে বসলেন—বিজয়, ক্যালসিয়াম।

—বাঃ বেশ সারছে মেয়েটি। বাঃ।

বিজয় দেরী করে বড়। ডাক্তারকে ব'সে থাকতে হ'ল নিষ্ক্রিয় হয়ে।

কি চেয়েছিল নির্মলা?

তৃষ্ণা

ক্ষুদিরাম হিসাব করতে বসেছিল—জীবনের হিসেব। চলতি কারবারে মানুষ বড় হিসাব-নিকাশ করে না; হিসাব-নিকাশ করলেও তলিয়ে দেখবার অবকাশ হয় না। তলিয়ে দেখে সে তখনই, যখন কারবারের তলা ফেঁসে যায়। ক্ষুদিরামেরও মনে হ'ল তার জীবনের কারবারের তলা ফেঁসে গিয়েছে; মনে হ'ল নয়—অনুমানের কথাই নয়—আঘাতটা প্রত্যক্ষ। এত বড় অপমান জীবনে তার কখনও হয় নাই। তাই সে হিসাব করছিল, কি করেছে, কি পেয়েছে! কিন্তু কুল-কিনারা করতে পারলে না। কি চেয়েছিল ঠিক সে বুঝতে পারলে না। যা ক'রেছে সে অবশ্য সবই মনে পড়ে, কিন্তু পায় নাই কিছুই। অনেকদিনের পুরানো একটা গান তার মনে পড়ে গেল।

"প্রাণ রসিক রে, পরের লাগি মিছে কাঁদেরে মন।
পর-পর ক'রে পরকাল হারালাম রেঁ—
তবু পেলেম না সে ধন।"

তাই বটে! শুধু পরকাল? ইহকালও গেল। মান যখন গেল, ইজ্জৎ যখন গেল তখন ইহকালের আর থাকল কি? গোপী মহান্ত মালা-ডুরি-আয়না-কাঁকুই বেচে বেড়ায় ফিরি ক'রে—শেষ পর্যন্ত তারই হাতে তাকে অপমানিত হতে হ'ল? হে ভগবান, তোমার নাম গান ক'রে চোর অপবাদ হ'ল তার?

হরিনাম সংকীর্তনের দলের ঝগড়া। সারা বৈশাখ মাস গ্রামে সংকীর্তন গান হয়, তার জন্য গ্রামে চাঁদা আদায় হয়। চার পয়সা থেকে পাঁচ টাকা পর্যন্ত চাঁদা আছে। এবার আদায় হয়েছে পঁয়তাল্লিশ টাকা কয়েক আনা।

ক্ষুদিরামই দলের মাতব্বর এবং মূলগায়েন, সে এই টাকা থেকে কাউকে জিজ্ঞাসা না করেই একখানা মৃদঙ্গ অর্থাৎ খোল কিনেছে আট টাকায়। ঝগড়া তাই নিয়ে। গোপী মহান্ত বলে—কাকে ব'লে তুমি কিনলে? আট টাকা শুধু মাটিটুকুর দাম? আর কিনবারই বা দরকার কি ছিল? গাঁয়ে খোল রয়েছে ছ' সাতখানা—আবার খোল কেনে?

গোপী চায় পুরো টাকাটা খরচ ক'রে একদিন বেশ ভালভাবে 'মচ্ছুব' অর্থাৎ মহোৎসব হোক।

ক্ষুদিরাম উপেক্ষা করেই বললে—মেলা বক বক করিস না বাপু। আমি যা' ভাল বুঝেছি করেছি।

আমড়ার আঁটীর মত বড় অথচ বিশ্রী দেখতে চোখ দুটো পাকিয়ে গোপী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলে—টাকা দলের সব লোকের, একা তুমি যা—

বাধা দিয়ে ক্ষুদিরাম লাফ দিয়ে উঠল, বললে—চোপরও!

ক্ষুদিরামের এই আকস্মিক বিস্ফোরণে প্রথমটা কয়েক মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হ'য়ে গেল গোপী, কয়েক মুহূর্ত পরে বললে—চোপরও?

—হাঁ চোপরও!

—কেন, তোমার হুকুমে না কি? তুমি কি রাজা না জমিদার, না—

বাধা দিয়ে ক্ষুদিরাম আবার লাফ দিয়ে উঠে বললে—আলবৎ।

গোপী এবার তার মুখের দিকে চেয়ে বললে—ব্যাঙ—তুই একটা ব্যাঙ!

ক্ষুদিরাম স্তম্ভিত হয়ে গেল। সে লাফাতে পারলে না, চীৎকার করতে পারলে না, শুধু অবাক বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে—আমি ব্যাঙ?

—তড়াক তড়াক ক'রে লাফাচ্ছিস্—ককর-ককর ক'রে চেঁচাচ্ছিস্ ব্যাঙের মতন, ব্যাঙ, তুই ব্যাঙ!

দলের কতক হো-হো ক'রে হেসে উঠল—কতক মুচকে হাসলে মুখ ফিরিয়ে। ক্ষুদিরাম গোপী মহান্তের দিকে চেয়ে রইল একদৃষ্টে।

ব্যাপারটা গড়াল অনেক দূর পর্যন্ত। একাধারে জমিদার, ইউনিয়ন বোর্ডের এবং কোর্টের প্রেসিডেন্ট, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট—তাঁর দরবার পর্যন্ত। গোপীই গিয়ে নালিশ জানালে।

ক্ষুদিরামেরও ইচ্ছা হ'ল—সেও একটা পাণ্টা নালিশ জানিয়ে আসে। কিন্তু পরমুহূর্তে'ই মনে হ'ল—ছি! সে আসামী হয়েই জমিদারের ওখানে হাজির হ'ল। সাদা কাপড়ের ছাউনী দেওয়া পুরানো ছাতাটি অভ্যাস মত বগলে নিয়ে এসে হেঁট হ'য়ে নমস্কার ক'রে দাঁড়াল।

ছোটখাটো মানুষটি নিজের হাতের সাড়ে তিন হাত হ'লেও আঠার ইঞ্চি হাতের মাপে পৌনে তিন হাতের বেশী নয়, সে হিসাবে ক্ষুদিরাম নামটি তার পক্ষে অত্যন্ত শোভন; গায়ে একটা ঢলঢলে ফতুয়া, গলায় দু-কণ্ঠি তুলসীর মালা, নাকের ডান দিকে একটা বড় আঁচিল, পরণে আধময়লা থান ধুতি। জমিদার দেখলেন—সেই পুরাতন ক্ষুদিরাম। ছেলেবেলায় ক্ষুদিরামকে তাঁরা বলতেন—'জলি গুড ফেলো'। তিনি বললেন—কি ব্যাপার ক্ষুদিরাম, তোমার নামে এরা নালিশ করে কেন?

জমিদারের কথার মধ্যে সহানুভূতি সুস্পষ্ট এবং তার ফলে ক্ষুদিরামের লাফিয়ে ওঠার কথা। কিন্তু ক্ষুদিরাম ক্লান্ত অবসন্নের মত মাটির উপরেই উপু হ'য়ে বসল এবং কোন উত্তেজনা প্রকাশ না ক'রে ম্লান হাসি হেসে বললে—আপনি বিচার করুন।

জমিদার তার দিকেই চেয়ে দেখছিলেন। এই অবসন্ন-ভঙ্গি ম্লান-হাসি ক্ষুদিরামের পক্ষে স্বাভাবিক নয়, অস্বাভাবিকতার মধ্যে তিনি দুর্বলতাকে আবিষ্কার করলেন বলে মনে হ'ল।

ক্ষুদিরাম পরক্ষণেই উঠে দাঁড়াল, বললে—আমার দোষ সাব্যস্ত হয় আমিই কানমলা খাব, নাকে খত দেব, আমি—। ক্ষুদিরাম মাথা হেঁট ক'রে আবার ব'সে পড়ল। কথাটাও শেষ করতে পারলে না। কানমলা নাকেখতের চেয়েও অপমানজনক শাস্তি জুতা খাওয়া, সেই কথাটাই তার মনে এসেছিল; কিন্তু সে

উচ্চারণ করতে তার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল, জিভ জড়িয়ে এল, কোন মতেই বা'র হ'ল না মুখ দিয়ে।

ক্ষুদিরামের দুর্বলতা সম্বন্ধে বিচারকের সন্দেহ এবার প্রত্যয়ে পরিণত হ'ল, তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন—এদের যা নালিশ সে তো তুমি জান। সে নিয়ে তোমার সঙ্গে কোন মীমাংসা হয়নি বলেই তো আমার কাছে এসেছে।

ক্ষুদিরাম মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে।

জমিদার বললেন—বিচার করতে গেলে আমাকে প্রথমেই বলতে হবে দলের সকলের মত না নিয়ে কাজ করা, মানে খোল কেনা তোমার অন্যায় হয়েছে। তবে—

ক্ষুদিরাম উঠে দাঁড়াল।

জমিদার বললেন—তবে তুমি মাতব্বর, এতদিন মূলগায়েনের কাজ করছ, তুমি যখন খোল একখানা কিনেছ তখন তাতে কারও আপত্তি করা উচিৎ নয়।

ক্ষুদিরামের ঠোঁট কাঁপছিল, সে কম্পন বেড়ে গেল। চোখে জলও এসেছিল, সে লজ্জা গোপন করবার জন্যেই আবার সে ব'সে পড়ল।

বিচারকের রায় তখনও শেষ হয় নাই, তিনি বললেন—তবে আমার বিচারে খোলের দাম ওরা যা সকলে মঞ্জুর করছে তার বেশী, মানে ছ'টাকার বেশী তুমি পাবে না। আট টাকার মধ্যে দলের টাকা থেকে ছ'টাকা দেওয়া হবে, আর দু'টাকা তোমাকে দিতে হবে।

ক্ষুদিরাম বুঝতে পারলে জমিদারের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত অর্থ। খোলের দাম আট টাকা বিচারক বিশ্বাস করেন নাই। অর্থাৎ—। সে স্তব্ধ হয়ে ব'সে রইল।

জমিদার বললেন—বুঝলে ?

ক্ষুদিরাম ধীরে ধীরে ফতুয়ার পকেট থেকে চারখানি দশটাকার, একখানি

পাঁচটাকার নোট এবং কয়েক আনা খুচরা বা'র করে জমিদারের সম্মুখে নাবিয়ে দিয়ে হেঁট হ'য়ে নমস্কার ক'রে উঠে দাঁড়াল। সবিনয়ে বললে—আমি যাই!

সমস্তটা দিন সে চুপ ক'রে ব'সে রইল। নিজেকে সান্ত্বনা দেবার অনেক চেষ্টা করলে। কৃষ্ণ নামে কলঙ্ক হয়! ঘুরিয়ে সে গাইলে—

"পরের লাগি মন উদাসী
লোকে হাসে বাঁকা হাসি
হায়, কাল কলঙ্ক রাশি হৈল অঙ্গভূষণ
তবু তো পেলেম না সে ধন—কঠিন পরের মন।"

পরের মনের চেয়ে কঠিন আর কিছু হয় না, লোহার চেয়ে কঠিন, লোহা গ'লে; পাথরের চেয়েও কঠিন, পাথর গুঁড়া হয়। ছেলেবেলা হ'তেই সে পরের মন পাবার জন্যই প্রাণপাত ক'রে আসছে।

তাদের আমলে ইস্কুলে ভাল ছেলে ছিল জটাধারী। লোয়ার প্রাইমারীতে বৃত্তি পেয়ে এখানকার মাইনর ইস্কুলে ভর্তি হয়েছিল। ক্ষুদিরাম তাকে ভালবেসেছিল। আর ভালবেসেছিল বাবুদের ছেলে অমরকে। অমরেন্দ্রনাথ—নামটাই কি সুন্দর! তেমনি সুন্দর ছিল সে দেখতে। লোকে বলত—পথে চ'লে যায়, পথ আলো হ'য়ে ওঠে। কথাটা মিথ্যা নয়। তেমনি ছিল তার কথাবার্তার স্ফূর্তি।

সেকালে, নবান্নে, পৌষপার্বণে, ভাদ্র এবং চৈত্র মাসের লক্ষ্মীপুজোয় জটাধারীকে সে নিমন্ত্রণ করত। গরীব চাষী সদগোপের ছেলে জটাধারী, এখানে বোর্ডিংয়ে থাকত—সে কি তৃপ্তির সঙ্গেই না খেত! যেটা ভাল লাগত সেটা সে চেয়ে নিত। বৈকালে বেড়াবার সময় জটাধারীর নিত্যসঙ্গী ছিল সে। কণ্ঠস্বর তার চিরকালই মিষ্ট, গান শোনাতো সে। সেকালের সে সব গান আজও মনে আছে তার। যাত্রার দলের সেই গানটা সবচেয়ে প্রিয় ছিল জটাধারীর। তুই

নির্বাসিত রাজপুত্রের মধ্যে ছোট রাজপুত্রকে গুপ্ত তীর মারে ষড়যন্ত্রকারীরা—ছোটরাজপুত্র মরছে, বড় ভাই কাঁদছে—

"ওরে ভাই অভি—কোথায় চ'লে যাবি"—

ছোট ভাই মৃত্যু যন্ত্রণার মধ্যেও ম্লান হেসে গান গেয়ে উত্তর দিলে—পরম জ্ঞানী ছিল সে—উত্তর দিলে—সমস্তই মায়া, তুমি কেঁদ না দাদা।

"সংসার সমুদ্রে ভাসিয়ে ভাসিয়ে—
তোমায় আমায় দাদা মিলেছি আসিয়ে—
আবার, কোথায় ভেসে যাব—আবার কা'র
ভাই হব—"

শুনে জটাটারী কাঁদত।

সহপাঠিরা ক্ষুদিরামকে ঠাট্টা করত জটাধারীকে ভালবাসার জন্য। বলত—ভালছেলের গায়ে গা দিয়ে ভালছেলে হবে! লাফিয়ে উঠত ক্ষুদিরাম, চীৎকার ক'রে বলত—নিশ্চয়!

অমরের সঙ্গে বেড়াতে সাহস পেত না সে। তাকে নিমন্ত্রণ করতেও পারত না। শূদ্র যাজক বর্ণ-ব্রাহ্মণ তারা। তবে মধ্যে মধ্যে তাদের বড়া, ক্ষীরের পিঠে এনে দিত। অমরের বরাত খাটত ছোটভাইয়ের মত। সরস্বতী পুজোয়, ক্লাসে-ক্লাসে, গ্রামে বোর্ডিংয়ে ফুটবল এবং হা-ডু-ডু-ডু ম্যাচ হ'ত, এ সবের পাণ্ডা ছিল অমর, ক্ষুদ্র ক্ষুদিরাম ছিল স্বেচ্ছাসেবক। কাজকর্ম করত, খেলার সময় পাশে দাঁড়িয়ে লাফাত, চীৎকার ক'রে উৎসাহ দিত।

জটাধারী এখন মস্তবড় ডাক্তার। আট টাকা ফি। বড় সাদা ঘোড়ায় চ'ড়ে রোগী দেখে বেড়ায়, এ পথেও যায় আসে। অমরেন্দ্রনাথ এখন মস্তবর ব্যবসাদার। কলকাতায় আপিস, সেখানেই বাড়ী করেছে, গাড়ী কিনেছে। সেও মধ্যে মধ্যে আসে গ্রামে। এখন দেখা হ'লে তারা অল্প একটু হাসে। কালে-কস্মিনে বলে—সব ভাল তো ক্ষুদিরাম!

শুধু কি জটাধারী আর অমরেন্দ্রনাথ। কত—কতজনের মন পাবার জন্য যে সে কত করেছে—ভাবতে গেলে সে একখানা মহাভারত হয়!

গ্রামের বড় বড় বাবুদের মাতব্বরদের মনের প্রসাদ পেতে কত না আগ্রহ ছিল তার! দূর থেকে বিস্ময়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকত। কোনক্রমে কাছে আসতে পারলে ভক্তির সঙ্গে প্রণাম করত।

তাদের চেয়ে বয়সে বড় ছিল যারা, হাল আমলের নতুন বাবুদের দল, তাদেরও কত ভালবাসত সে। বাবুরা বেড়াতে যেত—কতদিন সে তাদের পিছনে পিছনে যেত। তাদের ফেলে দেওয়া পোড়া সিগারেট সে কত কুড়িয়ে খেয়েছে।

ভাগ্যবান সব তারা। শুধু সে কেন? গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতাই তো তাদের ভালবাসত। তারা পথ দিয়ে যেত, পথের লোকে প্রণাম করত, তারা একটা কথা বললে লোকে কৃতার্থ হয়ে যেত। বউ-ঝিরা স'রে এক-পাশে দাঁড়িয়েও সসম্ভ্রম বিস্ময়ে তাদের লুকিয়ে দেখত।

শুধু একজন তাকে ভালবেসেছিল। ননীলাল দত্ত। তিনিও ছিলেন গ্রামের ভদ্রলোকদের একজন। মাতব্বর লোক। ননী দত্তই ছিলেন গ্রামের সংকীর্তনের দলের মূলগায়েন। বৈশাখের সন্ধ্যায় ধপধপে থান ধুতি প'রে চাদর গলায় দিয়ে কীর্তনের দল নিয়ে বা'র হতেন। চাদরের উপর থাকত ফুলের মালা। কোনদিন গুলঞ্চ চাঁপার, কোনদিন বেলফুলের, কোনদিন বা আউচর ফুলের মালা। পাশে থাকত চারখানা খোল। মেঘের ডাকের মত ধ্বনি উঠত মৃদঙ্গের। পথের পাশে বাড়ীর দরজায় দরজায় মেয়েছেলে পুরুষেরা আলো হাতে দাঁড়িয়ে থাকত। পথের ধুলায় মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করত, ধুলো তুলে মাথায় নিত। নধর দেহ ছিল দত্ত মশায়ের, নামে বিভোর হ'য়ে নাচতে নাচতে চ'লে যেতেন তিনি। পাড়ায় পাড়ায় চণ্ডী-মণ্ডপে গিয়ে গানকে দুনে চৌদুনে তুলে তেহাইয়ের মাথায় গান শেষ করতেন—তারপর আবার ধরতেন নূতন ক'রে ধীর লয়ে তানে। ক্ষুদিরাম

ছেলেবেলা থেকেই দলের পিছনে ছেলেদের সঙ্গে যেত। কিছুদিন পর গানের সুরে নিজের সুর মেলাবার চেষ্টা করত। খুব মৃদুস্বরে। ভয় হ'ত, লজ্জা হ'ত।

তৃতীয় বৎসরে, অর্থাৎ সে যে বৎসর থেকে সংকীর্তন দলের সঙ্গে বা'র হতে আরম্ভ করেছিল—তারই তৃতীয় বৎসরে একদিন গলা ছেড়ে গান ধ'রে দিলে দলের লোকের সঙ্গে। গানখানা তার মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছিল। অত্যন্ত শক্ত গান—তেওট—সাত মাত্রায় তাল—"দেখে এলাম শ্যাম, তোমার সাধের বৃন্দাবনধাম—শুধু নাম আছে।" ক্ষুদিরামের ছেলে-বয়সের গলা সকলের গলার সঙ্গে মিশেও সকলকে ছাড়িয়ে বাঁশের বাঁশীর সুরের মত বাজছিল।

মাধববাবুর ঠাকুরবাড়ীতে দত্ত গান শেষ ক'রে প্রশ্ন করলেন—কে একটি ছেলে গাইছিল? কে? কই? কোথায় সে?

ক্ষুদিরাম পালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তাদেরই পাড়ার নিশিকান্ত তার হাতে ধ'রে তাকে দত্তের সামনে হাজির করলে, বললে—হরিলাল চক্রবর্তীর ছেলে।

তার দিকে চেয়ে দেখলেন দত্ত, তারপর হাত ধ'রে নিজের কোলের কাছে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললেন—এইখানে আমার কাছে থাক তুমি। তাঁর নিজের গলায় ছিল দু'গাছি মালা; একগাছি মালা তার গলায় পরিয়ে দিলেন। সেই সন্ধ্যাটিই তার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্ধ্যা। আজও তার চোখের সামনে জ্বল-জ্বল করছে। মাধববাবুর ঠাকুরবাড়ীতে বাবুদের মেয়েরা দল বেঁধে দাঁড়িয়েছিলেন, বাবুরা বসেছিলেন—তাদের সামনে—সেদিন যে তার কি দিন!

ননী দত্ত তাকে তাঁর বাড়ীতে যেতে বললেন।—আমার বাড়ীতে যাবে তুমি, গান শেখাব আমি। ভুল শুধরে দেব।

ক্ষুদিরাম গাইত "হে প্রাণ গোবিন্দ তুমি দাঁড়াও হে ত্রিভঙ্গ হয়ে"—হাতে তাল দিতেন দত্ত। বলতেন—এই ছোট হ'য়ে গেল। আরও একটু টান—। এই দেখ। তাল দিয়ে নিজে ধরতেন—"হ'য়ে বাঁকা দাওহে দেখা শ্রীরাধারে বামে লয়ে।"

সে কি আমল গিয়েছে! সংকীর্তনের দলের সে কি জমজমাট! দত্ত মহাশয়ের ডাইনে থাকতেন যোগী দে, বাঁয়ে থাকতেন উপেন চক্রবর্তী—সামনে আলো নিয়ে যেতেন মোটা রাখালবাবু, মহাদেব ডাক্তার। মহাশয় লোক ছিলেন সব। মৃদঙ্গের ধ্বনি, গায়কদের কণ্ঠস্বর আকাশে উঠত। জেলেরা বাউড়ীরা আসত পিছনে খানিকটা তফাৎ রেখে। দত্তের কোলের কাছে থাকত ক্ষুদিরাম। ছোট ছেলে সে, তার উপর আকারে ছোট, নাচত সে হরিণের মত লাফিয়ে লাফিয়ে। দত্ত হাসতেন।

দত্ত মারা গেলেন। যোগী দে হলেন মূলগায়েন, উপেন চক্রবর্তী দাঁড়ালেন ডাইনে ; যোগী দে নিজে ক্ষুদিরামকে দাঁড় করিয়ে দিলেন বাঁয়ে—উপেন চক্রবর্তীর স্থানে। ক্ষুদিরামের বয়স তখন বিশ। দত্তের শব শ্মশানে যাবে—সংকীর্তনের দল এল, দাঁড়াল, সেই আসরেই যোগী দে তাকে এই সম্মান দিলেন। সে কি সমারোহের শবযাত্রা! বড় বড় লোকের শব শ্মশানে যায়—বড় বড় খাটে যায় দেহ, উপরে দামী শাল ঢাকা দেওয়া হয়, থলিবন্দী পয়সা ছিটানো হয়—লোকে দাঁড়িয়ে দেখে, দরিদ্রের দল পয়সা কুড়োবার জন্য পিছনে পিছনে ছোটে, সে এক ব্যাপার। আর এ একখানি খাটিয়ার উপর সাদা চাদরে ঢেকে নিয়ে গেল দত্তকে। আবালবৃদ্ধবনিতা কাঁদল। বললে—এমন মানুষ আর হবে না।

কথা তো মিথ্যা নয়। দেশে অনাবৃষ্টি হয়েছে, দত্ত সংকীর্তনের দল নিয়ে বেরিয়েছেন। দেশে মহামারী হয়েছে, দত্ত দল নিয়ে বেরিয়েছেন—হে মঙ্গলময়, তোমার নামে সব অমঙ্গল দূর হয়। মঙ্গল কর।

"নামের গুণে গহন বনে মৃত তরু মুঞ্জরে—
বল মাধাই মধুর স্বরে।"

দত্ত পরের মন পেয়েছিলেন। ক্ষুদিরাম আজও দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে। ভুল—সব ভুল। তার পক্ষে আগাগোড়াই ভুল হ'য়ে গিয়েছে। মূর্খ সে।

কতজন সে কথা তাকে বলেছে। তার স্ত্রী তো তাকে বারবার বলেছে এ কথা। তার মাও বলেছিলেন।

বাঁয়ের দোহারের স্থান পেয়ে সে সেইবারই একখানা গরমের চাদর কিনে বসল। ভাল চাদর, সে আমলে দাম নিয়েছিল আট টাকা। মা বলেছিলেন—আট টাকা দিয়ে চাদর কিনলি বাবা! একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসও ফেলেছিলেন মা।

ক্ষুদিরামও একটু লজ্জিত হয়েছিল, সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল এবং কিছুক্ষণ পর একখানা রেশমী নামাবলী এনে মাকে দিয়ে বললে—রোজ তুমি মায়ের স্থানে যাও, এইটা গায়ে দিয়ে যাবে।

মা তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন—ভবিষ্যতে তোমার কি হবে তাই আমি ভাবছি। আমার রেশমের নামাবলীর দরকার নাই বাবা, সে অবস্থা আমার নয়।

ক্ষুদিরাম চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

মা বললেন—ভগবানের নাম করা ভাল—খুব ভাল। কিন্তু আপনার অবস্থা বুঝতে হবে তো? নিজের ক্ষুদ কুঁড়ো যা আছে সে সব দেখতে হবে তো! একটু চুপ ক'রে থেকে আবার বললেন—লক্ষ্মী থাকলে নারায়ণ আপনি আসেন বাবা! লক্ষ্মীকে হতচ্ছেদা ক'রে নারায়ণকে ডাকলে তিনি সংসারীকে দয়া করেন না; তবে হ্যাঁ, ফকীর সন্ন্যাসীর কথা আলাদা।

স্ত্রী সাবিত্রীবালা বলেছিল—গরদের চাদর, ফুলের মালা গলায় দিয়ে নটবর সাজ না হ'লে বুঝি হরিনাম হয় না! জমে না!

—ছি! ছি! ছি! তোমাকে ছি! ক্ষুদিরাম আর আত্মসম্বরণ করতে পারলে না।

—আমাকে ছি নয়, তোমাকে ছি! শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না, বুঝেছ। ক্ষুদিরাম আবার বেরিয়ে এল বাড়ী থেকে, চাদরখানা ফিরিয়ে দিলে। মনে মনে স্থির করলে গিরিমাটি কুড়িয়ে এনে পুরনো কাপড়-চাদর রঙ ক'রে ফেলবে সে।

একটা খঞ্জনী হাতে নিয়ে একদিন বেরিয়ে পড়বে বাড়ী থেকে। তারপর মনে হ'ল যে, না, সংসারেই সে মন দেবে। মায়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক, স্ত্রীর ক্ষোভই দূর হোক। তাতে চোরাবালিতে প'ড়ে মানুষ যেমন তলিয়ে যায়, অতলের পাঁক এবং জলে মানুষ যেমন শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে, কেউ জানতে পারে না, তেমনি ভাবেই সে মরবে। ক্ষুদিরাম স্থির করলে—সংকীর্তনের দলে সে আর কোনদিন যাবে না। সংসারেই সে মন দিলে। ভোরবেলা ছাতাটি হাতে মাঠে যাওয়া সুরু করলে; ফিরত দুটোয়। কিছুদিন পর বাইরের ঘরে ছোটখাটো একখানা মুদীর দোকান খুললে।

হঠাৎ একদিন খোল-করতাল বাজিয়ে এক নতুন সংকীর্তনের ঢেউ এল। ওঃ সে কি ঢেউ! যেন সমুদ্রের ঢেউ। তের শো বারো সাল, তিরিশে আশ্বিন; আটখানা খোল, দশ-বারো জোড়া করতাল বাজিয়ে বেলা দশটার সময় দেড়শো-দুশো লোক গ্রামের ধনী ভদ্র শিক্ষিত ঘরের ছেলে বেরিয়ে পড়ল পথে। স্কুল বোর্ডিংয়ের অল্পবয়সী মাষ্টার এবং ছেলেরা পর্যন্ত। সে গানও মনে আছে ক্ষুদিরামের—

"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।"

স্বদেশী সংকীর্তন! তার ইচ্ছা হ'ল সেও নেমে পড়ে পথে। কিন্তু না। সে শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলে।

দল চ'লে গেল। পথে পথে দলের পিছনে কত জন চলতে আরম্ভ করলে। মাটির কোল থেকে আকাশের বুক পর্যন্ত সে যেন এক মহিমময় ধ্বনিতে ভ'রে গেল। ক্ষুদিরাম বাড়ী ফিরে এল। তার কারণ শুধু মা এবং স্ত্রীর প্রতি অভিমানই নয়; যে গান ওরা গেয়ে গেল—সে গান তো ক্ষুদিরাম জানে না।

আজও একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে ক্ষুদিরাম। ওই গান যদি জানত' সে!

ওই নতুন ঢেউ এসেই সেই পুরানো আমলের তাদের দল ভেঙ্গে দিলে। চৈত্রমাসের প্রথমেই সংকীর্তনের দলের আখড়া বসবার নিয়ম ছিল। খোলের ছাউনি দেখা হ'ত, করতালের দড়ি পাল্টানো হ'ত, গানের মহড়া দেওয়া চলত।

ক্ষুদিরাম যায় নাই আপনার সংকল্প মত। কয়েকদিন পর নিজে এসে হাজির হলেন যোগী দে, পুরুষানুক্রমে দে মশাইরা গ্রামের মণ্ডল। গ্রাম এখন ব্রাহ্মণ প্রধান, জমিদার এবং ধনী প্রধান। তবুও ওই দে মশাই আজও মণ্ডল। ক্ষুদিরাম ব্যস্ত হয়ে উঠল।—আসুন, আসুন।

হেসে দে বললেন—ব্যস্ত হয়ো না। বসবো না। কিন্তু কই তুমি যে সংকীর্তনের ওখানে যাচ্ছ না? মাথা নিচু ক'রে চুপ ক'রে রইল ক্ষুদিরাম।

দে বললেন—তা' হ'লে যা' শুনছি সত্যি?

চমকে উঠল ক্ষুদিরাম—কি শুনছেন? সে বিস্মিত হ'ল; তার মনের কথা কাউকে তো সে বলে নাই!

—বাবুদের দলে যাচ্ছ তুমি?

—বাবুদের দল? আজ্ঞে, কিছুই তো জানি না!

—বাবুদের ছেলেরা নতুন সংকীর্তনের দল বা'র করছেন এবার।

ক্ষুদিরাম বললে—আজ্ঞে না। কিছুই জানি না আমি।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দে মশাই বললেন—মাধববাবুর ছেলে পবিত্র বাবু আর এককড়িবাবুর ছেলে সত্যকিশোরবাবু পাণ্ডা হয়েছেন। গ্রামের সব গিয়ে জুটেছে ওখানে। আমাদের আসরে সাত-আট জন ছাড়া আর কেউ আসে না। তুমি না এলে তো চলবে না। দে মশাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

ক্ষুদিরামও দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলে পারলে না। তবুও বললে—একা মানুষ, চাষবাস, তার ওপর দোকান করেছি—

ভাল করেছ। তা' বলে ভগবানের নাম করবে না! আসবে, আজ থেকে আসা চাই।

সেই দিনই সন্ধ্যায় সে গিয়ে হাজির হ'ল। রাত্রে বাড়ী ফিরতে দেরী হয়েছিল। স্ত্রী বললে—আবার আরম্ভ হ'ল। তারপর হেসে বললে—কি? বলেছিলে যে আর যাবে না! ক্ষুদিরাম উত্তর দিলে না।

বারোজন লোক নিয়ে দল। আগে লোক হ'ত অন্তত পঁচিশ জন।

চারখানা খোলের দু'খানা গিয়েছে বাবুদের দলে। দশ জোড়া করতালের ছ' জোড়া করতালও গিয়েছে। হ্যারিকেন ঠেকল দুটিতে। বাবুদের দলে পনের-ষোলটা হ্যারিকেনের আলো। সেই ঝলমলে আলোর মধ্যে—গরদের ধুতি-চাদর প'রে গলায় মালা প'রে বাবুদের দল বা'র হয়। নতুন সুর—নতুন গান। সুর হাল্কা, বেশীর ভাগই বাউল, গান বাবুদের নিজেদের বাঁধা। সত্যকিশোর গান বাঁধতে জানেন, অতি সুন্দর গলা, ক্ষুদিরামের চেয়েও ভাল, তিনি মূল-গায়েন। লক্ষপতি মাধববাবুর ছেলে পবিত্রবাবু খোল বাজান। সে সব গানের কিছু কিছু আজও মনে আছে ক্ষুদিরামের।

"বংশী রেখে শঙ্খে তোল ধ্বনি—
জাগিয়ে তোল জাগিয়ে তোল সেনা নারায়ণী।"

গোটা গ্রাম যেন পাগল হ'য়ে গেল। বৈশাখের মাঝামাঝি বারো জনের আরও দু'জন চলে গেল ওদের দলে। ক্ষুদিরামদের দলের গান শুনতেও লোকের আগ্রহ কমে গেল। প্রবীণেরা শুধু শুনতেন; বাবুদের দলের আগে তাদের দল কোন চণ্ডীমণ্ডপে গেলে প্রধানেরা ছাড়া কেউ আসত না, বাবুদের দলের পরে গেলে প্রবীণেরা ছাড়া সকলে চ'লে যেত চণ্ডীমণ্ডপ থেকে। বয়স্ক দে মশাই ক্লান্ত কণ্ঠে গাইতেন—

"মাধব, হাম পরিণাম নিরাশা।"

তাঁর চোখে জল আসত। ক্ষুদিরামের চোখেও তার স্পর্শ লাগত। সমস্ত গ্রাম প্রদক্ষিণ শেষ ক'রে গ্রামের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দেবস্থান গাজনের শিবতলায় নামগান শেষ করবার সময় চার-পাঁচজনের বেশী লোক আর দলে থাকত না। দে মশাই বাড়ী ফিরতেন নির্বাক হয়ে। ক্ষুদিরাম এক একদিন বাড়ী ফিরেই শুয়ে পড়ত। বলত—শরীর খারাপ, খাব না।

সেদিন বাড়ী ফিরতেই তার মা বললেন—দোকানের মহাজন এসেছিল বাবা, বলে গিয়েছে অক্ষয় তৃতীয়ার দিন নতুন খাতা। বাকী সমস্ত টাকা মিটিয়ে না দিলে আর মাল দেবে না।

স্ত্রী ভাত বাড়ছিল, রান্নাঘরের ভিতর থেকেই সে বললে—বলেছে নালিশ করবে।

ক্ষুদিরাম তখন গভীরভাবে অন্য কথা ভাবছিল—সে যেন অন্ধকারের মধ্যে আলো দেখতে পেয়েছে। তাদের দলের পিছনে জেলেদের যে কয়েকজন দূরে দূরে সঙ্গে থাকে, তারা আজও কেউ ও দলে যায় নাই। পরের দিন সকালে নিজের দোকানের বাকীর তাগাদায় বা'র হ'ল সে। কিন্তু সর্বাগ্রে গেল দে মশায়ের ওখানে। বললে—জেলেরা দূরে থাকে, ওদের দলে নিতে দোষ কি? নামগানে তো জাতের ভেদ নাই!

—তা নাই। কিন্তু—। চুপ ক'রে গেলেন দে মশাই।

ক্ষুদিরাম সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে দে মশাই আবার বললেন—বে-তালা চীৎকার করবে। তা-ছাড়া ছোঁয়া-ছুঁয়ি, বাড়ী গিয়ে কাপড় ছাড়তে হবে।

আবার একটু পর বললেন—সে হয় না।

বৈশাখ সংক্রান্তির দিন দে মশাই করতাল জোড়াটি চক্রবর্তীর হাতে দিয়ে বললেন—আমার এই শেষ। আর বয়স হয়েছে। পরশু তারিখেই গোষ্ঠ গান হবে। ব্যবস্থা কর তোমরা।

ক্ষুদিরাম বাড়ী ফিরে মহাজনের পত্র পেলে: "মাল আর দেওয়া হইবে না। এক সপ্তাহের মধ্যে টাকা পয়সা মিটাইয়া না দিলে আইন অনুসারে কার্য করা যাইবেক।"

তের শো তের সাল, দোসরা জ্যৈষ্ঠ সকালে গোষ্ঠ, সন্ধ্যায় ফেরৎ গোষ্ঠ গেয়ে ফিরে দে বললেন—আমি আর নাই।

দল উঠে গেল। আষাঢ় মাসে ক্ষুদিরামের দোকানও উঠে গেল। ক্ষুদিরাম ঘরের কোণে আশ্রয় নিলে। তের শো তের সাল অনাবৃষ্টির বৎসর;

শ্রাবণের বিশে তারিখ পার হ'য়ে গেল, বর্ষণ হ'ল না। মানুষ আতঙ্কিত হ'য়ে উঠল। চারিদিক হাহাকারে ভ'রে গেল।

স্ত্রী বললে—দোকানটা থাকলে ধান না হ'লেও দোকানের আয়ে দু-মুঠো ভাত জুটত। হরিনামে মেতে দোকানটা ওঠালে তো!

মা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

একটু ম্লান হাসি ক্ষুদিরামের মুখে ফুটে উঠল। রাজার পাপে রাজ্য নষ্ট হয়, অরাজক হয় দেশ, প্রজা বিদ্রোহ করে, রাজার রাজ্য যায়; মানুষের পাপে সৃষ্টি নষ্ট হয়, ধর্মহীন হয় মানুষ, অনাবৃষ্টি দুর্ভিক্ষে মহামারীতে ভ'রে যায় দেশ।

হঠাৎ বাইরে থেকে ডাক এল—ক্ষুদিরাম।

ব্যস্ত হ'য়ে ক্ষুদিরাম বেরিয়ে এল।—কে? দে মশাই?

সত্যই দে মশাই। দে মশাই বললেন—সন্ধ্যেবেলা বেরুতে হবে। সকল গ্রামেই ভগবানের নাম ডাকছে জলের জন্যে। আমাদের কর্তব্য তো করতে হবে।

—বেরুবেন? ক্ষুদিরাম উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠল। কথাটা তার অনেকবার মনে হয়েছে।

দে মশাই হাসলেন—না বেরুলে? বাবুদের হরিনামের সখ মিটে গিয়েছে। থিয়েটারের দল গড়ছেন তাঁরা। তাঁদের সময় নেই।

শ্রাবণ-সন্ধ্যায় আবার দল বা'র হ'ল। কিন্তু লোক সেই দশ-বারোটি, শুধু এবার জেলের দলে লোক বাড়ল। জেলেদের পুকুরে জল চাই, মাছের ব্যবসায়ী তারা, তা ছাড়া জেলেরা এখন অবস্থাপন্ন হ'য়ে জমিও কিনেছে কিছু-কিছু। চাষের জন্যও তাদের উদ্বেগ আছে।

সেদিনের কথা মনে ক'রে এই প্রৌঢ় বয়সে ক্ষুদিরামের চোখে জল এল। দে মশাইয়ের সে কি প্রাণ দিয়ে ভগবানকে ডাকা! আর বিপন্ন মানুষেরও সে কি ভক্তি! জোড়হাত ক'রে সব এসে দাঁড়াল। গ্রামের ব্রাহ্মণ

জমিদারেরা পর্যন্ত জোর হাত ক'রে দাঁড়িয়ে দলের সঙ্গে সমস্বরে হরিধ্বনি দিলেন—হরিবোল—বরিবোল। মাণিকবাবুর ঠাকুর-বাড়ীতে নামের দলের তামাক খাওয়ার রেওয়াজ ছিল; নাম ছেড়ে তামাক খাবার সময় মাণিকবাবু বললেন—দে মশাই, আজ ক'দিন থেকেই ভাবছি যে খবর পাঠাই।

দে মশাই বললেন—হ্যাঁ দেখলাম, বাবুরা যখন বেরুলেন না, তখন বেরুলাম।

মাণিকবাবু বললেন— আপনি আর উপেন্দ্রের সঙ্গেই নামের দল শেষ।

দে মশাই হঠাৎ যেন কেমন হ'য়ে গেলেন, বলে উঠলেন—না-না-না। ক্ষুদিরাম রয়েছে। ক্ষুদিরাম পারবে। ও চালাবে।

—ক্ষুদিরাম ?

—এই যে ক্ষুদিরাম চক্রবর্তী। কি ক্ষুদিরাম ?

ক্ষুদিরাম মুখে কোন কথা বললে না, দে মশাইকে নত হ'য়ে নমস্কার ক'রে মাণিকবাবুকে, উপেন চক্রবর্তীকে প্রণাম করলে নীরবে। মাণিকবাবু মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন। ওঃ সে একদিন।

ক্ষুদিরামের সর্ব শরীর আজও রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠল।

ফিরবার পথে চীৎকার ক'রে উঠলেন দে মশাই। —ওঃ। বাপ-রে! কিসে কামড়ালে ?

সাপ। গোখরো সাপের বাচ্চা। অল্প আলোয় কারও চোখে পড়ে নাই, পথের মধ্যে দলের লোকের মাঝখানে প'ড়ে গিয়েছিল—দলের পুরোভাগে ছিলেন দে মশাই, তাঁকে সে আক্রমণ করেছে।

ভোর বেলায় দে মশাই মারা গেলেন।

গোপী মহান্তের বাবা বৃদ্ধ অবধুত এবং নবীন বৈরাগী খোল কাঁধে এসে দাঁড়াল।—চক্রবর্তী মশাই, ক্ষুদিরাম!

মহান্ত এবং বৈরাগীদের এটা সামাজিক দায়িত্ব। শবযাত্রায় তাদেরই আসতে হয় নামের দল নিয়ে। শ্রাদ্ধের সময় সিধা পায়, বৃত্তি পায়।

উপেন চক্রবর্তী উঠে দাঁড়ালেন—দে মশাইয়ের স্থান গ্রহণ করলেন—ক্ষুদিরাম দাঁড়াল ডাইনে। চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বর ভাল নয়, তবে তালজ্ঞ বহুদর্শী সম্মানী লোক; ক্ষুদিরামকেই প্রাণ দিয়ে গাইতে হ'ল। দে মশাইকে সে কথা দিয়েছে। দলের মান রাখতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যাতে ক্ষুদিরাম শিবতলায় এল। কেউ আসে নাই। অবধূত মহান্ত না, নবীন বৈরাগী না, উপেন চক্রবর্তীও না। শুধু জেলেরা ক'জন এসেছিল।

বৃদ্ধ বিপন জেলে বললে—ক্ষুদিরাম বাবা।

—এঁ্যা!

—ফিরে যাই তা' হ'লে?

—হ্যাঁ!

নামের দল উঠে গেল। চৈত্র মাসে ক্ষুদিরাম শিবতলায় গিয়ে ক্ষুণ্ণ হ'য়ে ফিরে এল। শুধু তাদের দলই নয়, বাবুদের দলও আর বা'র হবে না। সত্যকিশোরবাবু চাকরী পেয়েছে, গ্রামে নাই। পবিত্রবাবু থিয়েটারের দল নিয়ে ব্যস্ত।

পয়লা বৈশাখ সন্ধ্যায় ক্ষুদিরাম গ্রামের বাইরে গিয়ে ব'সে থাকল। গ্রামে-গ্রামান্তরে মৃদঙ্গ-ধ্বনি ধ্বনিত হ'য়ে উঠল, করতাল বেজে উঠল, মানুষের কণ্ঠের সমবেত সুর আকাশলোকে উঠে দিকে দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ল; ক্ষুদিরাম মনশ্চক্ষে দেখলে—ছেলেরা নাচছে দলের পিছনে, গ্রামের অস্পৃশ্যেরা আসছে আবও একটু পিছনে, ঘরের দুয়ারে দুয়ারে মেয়েরা দাঁড়িয়েছে সর্বাগ্রে, তাদের পিছনে অবগুণ্ঠনবতী বউয়েরা অবগুণ্ঠন সম্প্রসারিত ক'রে স্মিতদৃষ্টিতে চেয়ে আছে। পুরুষেরা দাওয়া থেকে নেমে পথের ধারে দাঁড়িয়েছে। সংকীর্তনীয়ারা চলেছে তা'র মধ্য দিয়ে, ভাবের আবেশে বিভোর হয়ে, পরণে কাচা কাপড়, গলায় কণ্ঠে কি গুলঞ্চ চাঁপার মালা।

ওরা ভাগ্যবান। নামগান অবশ্য ঘরে বসেও হয়, পুণ্য তাতেও আছে। কিন্তু দশের কল্যাণে দেশের মাটিকে পায়ে পায়ে পবিত্র করে, আকাশ বাতাসকে শুচি ক'রে এমনি নাম গান করার অধিকার ভাগ্য নইলে হয় না। সে ভাগ্য নিয়ে আসে নাই ক্ষুদিরাম।

নিজেদের গ্রামের দিকে ফিরে চাইলে সে। তাপক্লিষ্ট বৈশাখ সন্ধ্যায় গ্রামখানা যেন স্তব্ধ ঝিমিয়ে পড়েছে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠল সে।

গ্রামের মধ্যে ঢুকে সে আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বাবুপাড়া জমিদারপাড়া বেশ আছে। গম-গম করছে। বৈঠকখানায় সব মজলিস চলছে। ভাল তামাকের গন্ধ আসছে। এক জায়গায় গান-বাজনা চলছে। পবিত্রবাবুদের বৈঠকখানায় থিয়েটারের আখড়াই বসেছে। কার বাড়ীতে কলের গান হচ্ছে।

তাদের পাড়ায় এসে ঢুকল। খাঁ-খাঁ করছে পাড়াটা। নিঝুম নিস্তব্ধ। মধ্যে মধ্যে দু'একটা ছোট বাচ্চা গরজে কেঁদে উঠেছে। এক আধখানা বাড়ীর দাওয়ায় কেরোসিনের ডিবি জ্বালিয়ে দু'একজন প্রবীণা ব'সে আছে। তাদের কথা এসে কানে ঢুকল—নাঃ, সংকীর্তন আর আসবে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে তারা। ক্ষুদিরামও ফেললে।

বাড়ীতে ফিরে সে যা দেখলে তাতে বিস্মিত হ'ল না, একটু হাসলে—ম্লান হাসি। বৃদ্ধ বিপন জেলে ব'সে আছে জেলেদের ক'জন মাতব্বরকে নিয়ে: বেচারাদের মন মানছে না।

সে স্নেহ-কোমল-স্বরেই সম্ভাষণ করলে—বিপন, কতক্ষণ?

—এই যে বাবা! এই খানিকক্ষণ। কোথা গিয়েছিলেন গো?

—একটু কাজে। তারপর?

বিপন বললে—নামগান হবে না বাবা?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে ক্ষুদিরাম বললে—কই? হ'ল কই? কিছুক্ষণ সকলেই চুপ ক'রে রইল, ক্ষুদিরামই আবার বললে—নাঃ, আর হবে না।

বিপন কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে—আমরা একটা দল করতে চাইছি। তা'—। মাথায় হাত বুলালে বিপন।

ক্ষুদিরাম খুসী হয়ে উঠল। —বেশ তো! কিন্তু পরমুহূর্তেই সে নিরুৎসাহিত হ'ল, বললে—কিন্তু দল গড়া তো সোজা নয়। খোল করতাল—

ব্যগ্রভাবে বিপন মধ্যপথেই বাধা দিয়ে বলে উঠল—সে হবে বাবা। চাঁদা তুলেছি আমরা আজই সনদে বেলা। এমন আপুনি যদি—

—বল আমাকে কি করতে হবে?

আপুনি যদি মূলগায়েনি করেন—তবেই তো। না হ'লে—।

ক্ষুদিরাম অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করলে না। বললে—তাই হবে। হব আমি মূলগায়েন।

—তা' হ'লে চলেন। সব ব'সে আছে মনসাতলায়।

জেলেপাড়ার দেবস্থান মনসাতলা।

খোল বেজে উঠল। জন তিরিশেক জেলে নিয়ে দল। খোল বাজাচ্ছে কালি স্বর্ণকার, পাঁচু সূত্রধর। সোজা বাউল সুরে সে গান ধরছে অতি-পরিচিত পুরানো গান—

"বল মাধাই মধুর স্বরে,
হরিনাম বিনে আর কি ধন আছে সংসারে!
হরি-নামের গুণে গহন বনে ডাকলে নিতাই পার করে"

একটি জেলের মেয়ে এসে ডাকলে বিপনকে—কাকা!

বিপন হাত বাড়ালে—মেয়েটি তার হাতে দিলে একগাছি গুলঞ্চচাঁপার মালা। বিপন ক্ষুদিরামের গলায় পরিয়ে দিলে।

অতীত কথা স্মরণ ক'রে হাসলে ক্ষুদিরাম।

পায় সমস্ত গ্রামটা ছি-ছি ক'রে উঠল ক্ষুদিরামকে। জেলেদের দলে মিশেছে ক্ষুদিরাম। ছোটজাত, ছুঁলে স্নান করার বিধি, শেষ পর্য্যন্ত তাদের সঙ্গে! বললে—কালি স্যাকরা খোল বাজাচ্ছে, সে বিপন জেলের খাতক,

তা' ছাড়া ওর কারবারই হ'ল রূপোর গয়নার কারবার, জেলেরা তার মোটা খরিদ্দার। পাঁচু ছুতোর বাজাচ্ছে, সে জেলের বাড়ীর ভাতই খায় একবেলা। চাঁদ জেলের বিধবা মেয়েটার ঘরে তার আস্তানা। কিন্তু ক্ষুদিরাম ?

ক্ষুদিরাম নিশ্চয় দোকানের মহাজনের দেনার টাকা ধার করছে বিপনের কাছে কি গিরিধরের কাছে। হরিলাল-রাজবল্লভও হতে পারে, ওদেরও টাকা আছে।

বলুক যে যা বলবে বলুক। ক্ষুদিরাম মানবে না।

হায়রে মানুষ! যত কঠিন তার মন তত তার জিভের ধার। চোখের কালো তারায় তার তত কালী। দু'দিন পর তার স্ত্রী বললে—বিপনের ভাই-ঝি তোমার গলায় মালা দিয়েছে ?

স্তম্ভিত হ'য়ে গেল ক্ষুদিরাম।—বিপনের ভাই-ঝি ?

—হ্যাঁ গো! অদ্ভুত দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে সে বললে—যে দেখেছে নিজের চোখে সেই এসে বলে গিয়েছে।

—মিছে কথা। মালা দিয়েছিল বিপন।

আর কোন কথা না বলে স্ত্রী বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বাইরে থেকে বললে—মায়ের কাছে শুচ্ছি গিয়ে আমি।

ক্ষুদিরাম অন্ধকারের মধ্যে স্তব্ধ হ'য়ে বসে রইল সারারাত। সকালবেলা মা বললেন—আমি দিন কতক ভাইদের ওখানে যাচ্ছি বাবা, প্রাণ আমার ছাড়-ছাড় করছে, আমি আর সইতে পারছি না।

মা চ'লে গেলেন। স্ত্রীও চ'লে গেল তাঁর সঙ্গে। মামার বাড়ীর পাশেই ক্ষুদিরামের শ্বশুরবাড়ী।

ক্ষুদিরাম তবু ক্ষান্ত হ'ল না। বৈশাখের স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে সে নিজের মনকে দৃঢ় করছিল এমন সময় দরজায় কে শিকল নাড়া দিলে।

—কে ?

উত্তর কেউ দিলে না! শিকলটাই আবার ন'ড়ে উঠল। উঠে গিয়ে

দরজা খুলে দিলে ক্ষুদিরাম। দরজা খুলে ঢুকল বিপনের ভাই-ঝি। চমকে উঠল ক্ষুদিরাম,—কি ?

একটু হেসে সুরধুনি বললে—কাকা মাছ পাঠিয়ে দিলে।

ক্ষুদিরাম বললে—নিয়ে যাও মাছ। বাড়ীতে কেউ নাই। আমি একা, মাছের দরকার নাই আমার।

সুরো প্রগল্‌ভা মেয়ে, পাড়ায় গ্রামে তার খ্যাতিও ভাল নয়। সে মাছটা দাওয়ার উপর ফেলে দিয়ে বললে—ফিরে নিয়ে যেতে আমি আসি নাই। দিতে এসেছি দিলাম, ফেলে দিতে হয় দিয়ো তুমি।

—সুরো! সুরো!

—হ্যাঁ ভাল কথা। ফিরে দাঁড়াল সুরো। হেসে বললে—হ্যাঁ-গো! তোমার নাকি আমার ওপর মন পড়েছে? লোকে বলছে! মুখে কাপড় দিয়ে সে হাসতে লাগল।

ক্ষুদিরাম স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। সে বলে উঠল—তুই যা। তুই যা।

—তাড়িয়ে দিচ্ছ? সুরো আবার একটু হাসলে। তারপর নিঃশব্দে বেরিয়ে চ'লে গেল।

কিছুক্ষণ পর ক্ষুদিরাম বেরিয়ে পড়ল বাড়ী থেকে। বিপনের বাড়ীতে গিয়ে বিপনকে বললে—আমাকে রেহাই কর বিপন। আমার দ্বারা হবে না। আমি পারব না।

বিপন বললে—আমি জানি। দোষ আর আপনাকে কি দোব বলেন। ছোট কুলে জন্মের দোষ। আমাদের নেকন।

ক্ষুদিরাম সেইদিন থেকেই ঘরে এসে বসল।

ক্ষুদিরাম আপনার ঘরে ব'সে মৃদুস্বরে নামগান করত। যেন কেউ শুনতে না পায়।

মধ্যে মধ্যে আসত অবধূত আর নবীন অবধূতের মৃত্যুর পর নবীনের সঙ্গে আসত গোপী। গ্রামের সজ্জন সম্ভ্রান্ত কেউ মারা গিয়েছে, শবযাত্রার সঙ্গে

সংকীর্তনের দল যাবে, ডাক পড়েছে। দায়িত্ব অবধূত আর নবীনের, তারা এসে ভরসার দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে তাকিয়ে বলত—একবার চল ভাই।

ক্ষুদিরাম না বলতে পারত না। নবীন আর অবধূত বা গোপী বাজাত খোল—এ ছাড়া লোক থাকত মাত্র তিন-চারজন। তাই নিয়ে শবের আগে আগে চলত। এখনও যায়।

লোকে বলে—ক্ষুদিরাম, তোমার জন্যেই এটুকু আজও আছে।

ওইটুকুই সে অনেক বলে মেনে নিয়েছে। কখনও কখনও গোপীকে নবীনকে বলেছে, দু'-একবার শবযাত্রার সময়ে ওই কথাটা উঠলে বলেছে—আমার তো কোন বৃত্তি নাই, আমি মরলে যেন সবাই নাম গেয়ে আমাকে নিয়ে যাবেন।

শুধু গঙ্গাতীরে যে-সব ভাগ্যবানের দেহ যায়—সেই সব শবযাত্রায় দল ভারী হয়। গঙ্গা এখান থেকে দশ ক্রোশ পথ। ট্রেনে যাওয়ারই পদ্ধতি। মাল-গাড়ীতে শব যায়। ট্রেনে যায় শ্মশান-বন্ধুরা। সেখানে গাঁজা মেলে বেশী। লুচি মেলে পেটপুরে। ক্ষুদিরামের দুঃখও হয়, হাসিও আসে।

সেই ছিল বেশ। বারো বৎসর পর সংকীর্তনের দলের ধুয়ো উঠল। এতদিন শুধু জেলেরা এলোমেলো বেতালা বেসুরো নামগান করত, হঠাৎ আবার খেয়াল উঠল ভদ্রপল্লীতে।

সম্পদে সমারোহের মধ্যে মানুষের তো জ্ঞান থাকে না। গেল যুদ্ধের বাজারে কলকাতায় কয়লার ব্যবসা ক'রে বাবুরা ফেঁপে উঠল, বাঁশ বেঁধে থিয়েটার করা ছেড়ে—পাকা ঘর করলেন বাবুরা। আজ থিয়েটার কাল থিয়েটার। বাজারে দোকানদারেরাও দু'-চার হাজার লাভ করলে। পঞ্চানন খুললে যাত্রার দল। ঘাড় ছেঁটে চুল কাটা ছেড়ে বাবড়ী চুল রাখতে আরম্ভ করলে ছোকরারা। মাইনে ক'রে লোক নিয়ে এল—ড্যান্সিং মাষ্টার, নাচিয়ে ছোকরা।

বাজার পড়ল। বাজারের যাত্রার দল উঠে গেল। বাবুদের বারো মাসে

তেরোবার থিয়েটার বন্ধ হ'ল। বছরে একবারে এসে ঠেকল। শেষ পর্যন্ত দল নিয়ে ঝগড়া। সব চেয়ে ধনী মাধববাবুরা, মাধববাবুর ছেলে পবিত্রবাবুই ছিলেন থিয়েটারের প্রধান লোক, পাকা ঘরে তাঁরাই দিয়েছেন বেশী টাকা। তাঁরা বলেন—দল উঠে গেলে ঘর আমাদের। দল থাকলেও আমাদের কথা মতই চলতে হবে। এখন সব বছর একবার থিয়েটারও হয় না।

সেবার হঠাৎ গ্রামে হ'ল কলেরা।

সম্পদ হারিয়ে বিপদে প'ড়ে লোকের ভগবানকে ডাকতে মনে হ'ল।

দশজনে এসে ধরলে। ক্ষুদিরাম না বলতে পারলে না।

সেইবার থেকে আবার দল বা'র হ'ল। ক্ষুদিরাম মূলগায়েন। মূলগায়েন! ক্ষুদিরাম আপন মনেই কতবার হেসেছে। সে রামও নাই সে অযোধ্যাও নাই। ননী দত্তের ভাগ্য যোগী দে'র ভাগ্যের সঙ্গে ক্ষুদিরামের ভাগ্যের অনেক তফাৎ!

ক্ষুদিরামকে দালালী করতে হয় দলের জন্য। সে এখন কাজ করে শম্ভু দত্ত মহাজনের কারবারে। ষ্টেশনে যায় ধান চাল বোঝাই দেখতে, মাল খালাসের তদ্বির করতে। মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ আছে, মাষ্টারকে মধ্যে মধ্যে গান শোনায়; গান শেষ ক'রে বলে—একদিন সংকীর্তনের দল নিয়ে আসব ইষ্টিশানে।

মাষ্টার বলেন—দল?

—হ্যাঁ। দল। হরিনাম হোক, ভগবানের নাম। কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে অকারণে একটু হেসে নাকের আঁচিলটিতে হাত বুলিয়ে বলে—কি বলছেন?

—তা বেশ। কিন্তু আটটার গাড়ীর পর।

সোৎসাহে ক্ষুদিরাম বলে—সে তো নিশ্চয়। আবার একটু চুপ ক'রে থেকে বলে—কিছু হরির লুট দেবেন। বাতাসা আড়াই সের, কাঁচাগোল্লা পাঁচ পো। না হয় যুগেশের দোকানের খাসমণ্ডা।

আবার কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বলে—খাবে সব দলের লোক। বুঝলেন কি না!

ষ্টেশন মাষ্টার হাসেন।—আচ্ছা তাই হবে।

গ্রামের হীরেনবাবু কলকাতায় থাকেন, সেইখানেরই বাসিন্দা আজকাল, মধ্যে মধ্যে আসেন, ধান বিক্রী ক'রে দেন। ওজন ক'রে দেবার জন্য ক্ষুদিরামকে ডাকেন। সৎ লোক—ধাম্মিক লোক। ক্ষুদিরাম ওজনের কাজ শেষ ক'রে বলে—এবার নামের দলের পার্বণী আমরা পাই নাই।

—কত?

নাকের আঁচিলটিতে হাত বুলিয়ে ক্ষুদিরাম বলে—মিথ্যে কথা তো বলব না, পাই দু' টাকা, কিন্তু না বাড়ালে আর চলছে না।

—আচ্ছা, বল কি চাও?

—চার টাকা ক'রে দেন।

—তাই হবে।

এমনি ভাবেই মাধববাবুদের বাড়ীর পার্বণী চারটাকাকে সে ছ'টাকা করেছে।

এর জন্যে মনে মনে দুঃখ হয় তার, একা ব'সে যখন ভাবে তখন লজ্জাও অনুভব করে। তবুও এসব সে না ক'রে পারে না। নইলে দল উঠে যাবে।

মা নাই, স্ত্রীও মারা গিয়েছে—দল উঠে গেলে কি নিয়ে থাকবে সে? শুধু সেই বা কেন? ভাঙনধরা গ্রামখানির লোকেই বা কি নিয়ে থাকবে? যাত্রা নাই থিয়েটারও নাই আর, সন্ধ্যায় মেয়েছেলেরা সংকীর্তনের দলের জন্য বসে থাকে। আগেকার মত সে রুচি নাই সে কথা ঠিক, সব শোনে যেন শুনতে হয় বলে—তবুও ব'সে থাকে। আর—এই ভাগ্য—! নাম ডেকে গাঁয়ের কল্যাণ করার ভাগ্য—এ ভাগ্য থেকে বঞ্চিত হবার কল্পনাও সে করতে পারে না। এইটুকুই তার ভাগ্যের সম্পদ। নইলে সে আর কি—কতটুকু লোক! সামান্য মানুষ, ত্রিশ বিঘা জমির দশ বিঘা গিয়েছে মায়ের এবং স্ত্রীর শ্রাদ্ধে। বিশ বিঘা

জমি আর মহাজনের দোকানের চাকরী মাত্র তার সম্বল। তাই দলের জন্ত সবই সে করে।

রাত্রে সংকীর্তন গান শেষ হয়। যে যার বাড়ী চ'লে যায়, খোল করতাল তাকে সযত্নে তুলে রাখতে হয়! তার বাড়ীতেই থাকে। মধ্যে মধ্যে জেলেরা আসে, তারা গান নিয়ে যায়। ক্ষুদিরাম সহজ বাউল সুরে সোজা গান শিখিয়ে দেয়। ওই একটা তার দুঃখ, ও বেচারাদের সে দলে নিতে পারলে না। বিপন নাই, গিরি নাই, রাধাবল্লভ নাই—তাদের ছেলেরা আছে। তারা আসে। সুরোও আছে। সুরোর সঙ্গে ক্ষুদিরাম আজও কথা বলে না। ওই মেয়েটার উপর বিতৃষ্ণা-বিরূপতা আজও ক্ষুদিরামের যায় নাই। সে তার দিকে চেয়ে দেখে না পর্যন্ত; সে পথ দিয়ে চলে গেলে ক্ষুদিরাম মুখ ফিরিয়ে থাকে। সে ভুলতে পারে না—ওরই জন্য একদিন মিথ্যা অপবাদ তাকে সহ্য করতে হয়েছিল। তার স্ত্রীর কথা মনে পড়ে, তাদের কথার জ্বালা এখনও যেন সে অনুভব করে। গ্রামের লোকের বাঁকা হাসি মনে পড়ে।

সমস্ত কথা আগাগোড়া মনে ক'রে সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে! এত করেই বা হ'ল কি? এতকাল পরে দুটো টাকা চুরির অপবাদ তার মাথায় চাপিয়ে দিলে নিসংশয়ে, নির্বিচারে নয়—বিচার ক'রে! হায়রে মানুষ! হায়রে তোর কঠিন মন! পাথরের মত কঠিন, ঠুঁকলে চোরের মাথাও ভাঙে, সাধুর মাথাও ভাঙে।

চাকরীতে এই নিয়ে একটা বেলা কামাই হ'য়ে গেল। বিচারের জন্য গদীর মালিকের কাছে ছুটি নিয়েছিল সে একবেলা। কিন্তু বিচারে লেগেছিল মাত্র আধঘণ্টা, বাকী সময়টা বাড়ীর দাওয়ায় একা ব'সে ওই হিসেব-নিকেশ করতেই ফুরিয়ে গেল।

পরদিন সকালে উঠে ফতুয়া গায়ে দিয়ে ছাতা বগলে সে বা'র হ'ল। অনেক দিনের পর মাঠ ঘুরে আপনার জমিগুলি দেখে এল সে। সে ঠিক করেছে আপনার নিয়েই থাকবে। কাজ নাই তার দশের কল্যাণ ক'রে, পরের মনের

সাধ্যসাধনায় তার কাজ নাই। জমি দেখে সে চাকরীতে যাবে, চাকরীর কর্তব্য শেষ ক'রে বাড়ী ফিরে আপনাকে নিয়েই থাকবে।

গ্রামে ঢুকতেই ষ্টেশন। ষ্টেশন থেকে একজন কে নেমে তার দিকে এগিয়ে এল। কে? ও। হরিনারান। নামের দলের একজন পাণ্ডা। তিক্ত হাসি ফুটে উঠল ক্ষুদিরামের মুখে। গোষ্ঠ গান গাইতে হবে যে। ক্ষুদিরামকে দরকার হয়েছে।

ক্ষুদিরামের অনুমান সত্য।

কাছে আসতেই হরিনারান বললে—কোথা গিয়েছিলে গো? আজ যে গোষ্ঠ গাইতে হবে।

ক্ষুদিরামের ঠোঁট দুটো থর-থর ক'রে কেঁপে গেল কথা বলতে গিয়ে, সে বলতে গিয়েছিল একটু হেসে একটি কথা—না। কিন্তু তার ঠোঁট, তার জিভ, তার বুকের ভিতরটা সব যেন তার আয়ত্তের বাইরে চ'লে গিয়েছে।

হরিনারান বললে—চল, একটুকুন পা' চালিয়ে চল।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে সে বললে—না। এইবার একটু হাসতে পারলে সে, হেসে বললে—আমি তো কালই বাবুর দরবারে দেশের সামনে ইস্তফা দিয়েছি। কথা শেষ ক'রে সে হরিনারানের মুখের দিকে চাইলে।

হরিনারানের মুখে কিন্তু একবিন্দু ব্যাকুলতার কি বিপন্নতার ছাপ ফুটে উঠল না, বরং ভ্রূ দুটো কুঁচকে উঠল তার, বললে—তা' হলে আমাদের খোল।

—খোল ত আমার, দলের পুরো টাকা তো আমি মিটিয়ে দিয়েছি।

হরিনারান বললে—নতুন খোল নয়, পুরানো খোল-করতাল। সে সব গুলো দিতে হবে তো!

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। ক্ষুদিরাম এক মুহূর্তে কুণ্ঠিত হ'য়ে গেল। সেগুলো তার বাড়ীতে আছে। ঠিক কথা। মনে ছিল না তার আবার তার কথা বলতে গিয়ে বুকের ভিতরটা কেমন ক'রে উঠল ঠোঁট কাঁপতে লাগল।

হরিনারান বললে—কি বলছ? সেগুলো দেবে? না আবার নালিশ করতে—

বাধা দিয়ে ক্ষুদিরাম বলে উঠল—না-না-না। চল। চল।

প্রাণপণ দ্রুতগতিতে সে চলল—এস—এস—এস। প্রায় ছুটছে সে।

গোষ্ঠের গান গাইতে গাইতে দল চলেছে। মেয়েরা দুয়ারে দাঁড়িয়ে দেখছে। আজ দলে ওরা একটু সমারোহ করেছে, লাল কাগজের পতাকা করেছে, ছেলের দল নাচতে নাচতে চলেছে পতাকা নিয়ে। দলের লোকেদের গলায় ফুলের মালা, মালা খোলে দেওয়া হয়েছে। মূলগায়েন হয়েছে গ্রামের ছোকরা-গাইয়ে ভোলানাথ।

ক্ষুদিরাম নিজের দাওয়ায় দাঁড়িয়ে দেখছিল। তার ঠোঁট কাঁপছে, চোখে জল আসছে, বুকের ভিতরটা কেমন করছে। হায়রে মানুষ! দলটা গান গেয়ে চ'লে গেল, লোকে চিরকাল যেমন দাঁড়িয়ে দেখে তেমনি দেখলে, পথের ধুলো তুলে নিলে, কেউ একবার এতটুকু বিস্ময় প্রকাশ করলে না, বললে না—দলটা খালি-খালি ঠেকছে, বেমানান ঠেকছে! প্রশ্ন করলে না—ক্ষুদিরাম মূলগায়েন কই?

সে প্রায় ছুটে গিয়ে ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ছোট ছেলের মত কাঁদতে লাগল সে। ভুল—ভুল—সব ভুল। মিথ্যে। তার জীবনের আগাগোড়াই সে মিথ্যের পিছনে ছুটেছে। মানুষ কোন দিন তাকে ভালবাসে নাই, মানুষের মন সে পায় নাই।

—চক্রবর্ত্তী! চক্রবর্ত্তী! বাইরে কে ডাকছে।

সে উঠে ব'সে আপনাকে সম্বরণ ক'রে সাড়া দিলে—কে?

—আমি ঘোষ। মালিক ডাকছেন। যান নাই কেন? এমন ক'রে কামাই করলে কাজ চলে না।

দোকানের লোক।

মুহূর্তে বলে উঠল ক্ষুদিরাম—চাকরী আমি আর করব না, বলে দাও গিয়ে।

—চাকরী করবেন না?

—না।

—হ'ল কি?

উত্তর দিলে না ক্ষুদিরাম। সে কাঁদতে লাগল।

—শুনছেন?

আকাশের দিকে চাইলে ক্ষুদিরাম। "পর পর ক'রে পরকাল হারালাম রে—তবু পেলাম না সে ধন।"

আর একবার শিকল নেড়ে ঘোষ ডাকলে—শুনছেন!

দর-দর ক'রে চোখ দিয়ে জল পড়ছে ক্ষুদিরামের। "প্রাণ রসিকরে, পরের লেগে মিছে কাঁদরে মন।"

বাইরে পায়ের শব্দ উঠল। চ'লে গেল ঘোষ।

"শুধু কালো কলঙ্ক-রাশি হৈল অঙ্গ-ভূষণ।"

চোখের জল মুছে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে সে। সব মিছে হয়েছে তার।

আবার দরজার শিকল ন'ড়ে উঠল। বিরক্ত হ'য়ে উঠল ক্ষুদিরাম। চোখ-মুখ আবার একবার মুছে নিয়ে তিক্ত চিত্তেই সে দরজা খুললে। কড়া জবাব সে দেবে এবার।

—বাবা ঠাকুর!

বিপনের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে আরও দু'জন জেলে। ডাইনের বাঁয়ের দোহার।—গোষ্ঠ গানের পদটি যে ভুল হ'য়ে গেছে বাবাঠাকুর! দল বা'র করতে গিয়ে ছুটে এলাম। পদটি একবার ব'লে দাও।

তাদের মুখের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল ক্ষুদিরাম। বিপনের ছেলে বললে—বাবাঠাকুর?

ক্ষুদিরাম বললে—তোদের দলে চল আমি গেয়ে দিয়ে আসি।

—আপুনি যাবেন ?

—হ্যাঁ। নিবি আমাকে ?

প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে বিপনের ছেলে বললে—আপুনি তো আমাদের মাথার মণি গো !

জেলেদের দলের মূলগায়েনি ক'রে গ্রাম ঘুরে এল ক্ষুদিরাম অসঙ্কোচে। যেমন নাচত গানের মাতনের সঙ্গে তেমনি নাচলে, ধুলোয় ভ'রে গেল শরীর! আঃ! হিসেব-নিকেশের একটা অঙ্ক তার ছুট পড়েছিল। ছুট পড়েছিল জমার দিক। পাওনার দিক!

গান শেষ ক'রে ফিরবার পথে হঠাৎ সে দাঁড়াল। সামনেই সুরোর বাড়ী। সুরো রান্না করছে। সে আজ সুরোর দিকে চাইলে। সুরো প্রৌঢ়া হ'য়ে চুলে পাক ধরেছে। এতদিনের মধ্যে সে তার দিকে চায় নাই। এ পরিবর্তন তার কাছে নতুন আকস্মিক বলে মনে হ'ল।

সুরোর চোখে চোখ পড়তেই মিষ্টকণ্ঠে সে বললে—ভাল আছ সুরো ?

সুরো অবাক হ'য়ে গেল।

সুরোর হিসেবটা জমার দিকে না খরচের দিকে বুঝতে পারলে না ক্ষুদিরাম।

আরোগ্য

এত সুখ এত শান্তি এত তৃপ্তি রাসুঠাকরুণ কখনও পায় নাই। অনেক কাল আগে রাসুঠাকরুণের একবার কঠিন অসুখ করেছিল; নানা উপসর্গ সঙ্গে নিয়ে দীর্ঘকাল স্থায়ী জ্বর। অবিরাম ভোগ করত, গুমগুমে জ্বর। সেই জ্বর যেদিন ছেড়েছিল—সেদিন রাসুঠাকরুণ ঠিক এমনি—ঠিক এমনি নয়—অনেকটা এমনি ধারার অবস্থা অনুভব করেছিল। ক্লান্তি—ঘুমপাওয়া—এ দুটো ঠিক তেমনি, ঠিক অবিকল তেমনি। শ্বশুরবাড়ীর ভাঙা বাড়ীর খোয়া উঠা ধূলিধূসর এককালের পাকা দাওয়াটার উপর শুয়ে রাসুর মনে হ'ল—সমস্ত জীবন—বোধ হয় জন্ম থেকে, এপর্য্যন্ত সে ভুগছিল একটা অবিরাম গুপ্ত জ্বর রোগে। সে জ্বরটা তার আজ ছেড়ে গেল। নিস্তব্ধ হ'য়ে সে শুয়ে রইল, অর্থহীন দৃষ্টিতে সে তাকিয়েছিল। আকাশ এমন চমৎকার নীল তার কখনও মনে হয় নাই। আকাশের কোলে গ্রামের বড় বড় গাছগুলি ঘন সবুজ। আশ্বিনের শেষ—রোদ আশ্চর্য্য রকমের সুন্দর, যেন ঝলমল করছে। বাতাস চমৎকার মিষ্টি; সর্বাঙ্গ যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে আসছে কিন্তু নীল আকাশের দিকে আকাশের কোলে অশ্বত্থ বট শিরীশ—বিশেষ ক'রে গ্রামের শেষ সীমানায় সরকার পুকুরের বহুকালের পুরনো লম্বা তালগাছগুলির সবুজ কাঁচা পাতাগুলি দেখতে তার বড় ভাল লাগছিল।

রাসুঠাকরুণ—রাসমণি দেবী—শাঁখপুরের জমিদার বাড়ীর মেয়ে—মেয়ে নয় ভাগ্নী—রতনহাটির মুখুজ্জে বাড়ীর বউ দীর্ঘকাল পরে ফিরে এল রতনহাটিতে। ছোট গ্রাম, রত্ন সম্ভারের হাট এখানে কখনও কোন কালে

বসত কিনা সে-কথা কেউ জানে না তবু নাম রতনহাটি। পঁচিশ-তিরিশ ঘর বাউড়ী-বাগ্দী, ঘর সাতেক চাষী কৈবর্ত; এক ঘর ব্রাহ্মণ—ওই মুখুজ্জে-বাড়ী। ওই মুখুজ্জেদের ছিল বিঘে বিশেক জমি, দুটো পুকুর, মাটির কোঠা-বাড়ী আর ছিল আটষট্টি টাকা তের আনা ছ' গণ্ডা দু'কড়া আয়ের একখণ্ড জমিদারী—ওই শাঁখপুরের সন্নিকটে। সেই সূত্রেই এ বিয়ে সম্ভবপর হয়েছিল। বৈকুণ্ঠ বাগ্দী বলে—মেয়েতে আর ভাগ্নীতে তফাৎ নাই শাঁখপুরের জমিদার বাড়ীতে, এ বিয়ে একটা অঘটন। বৈকুণ্ঠ আজও বেঁচে আছে; রাসু বউঠাকরুণ ফিরে এসেছে শুনে সে অবাক হ'য়ে গেল। মুখুজ্জে বাড়ীর বড় ছেলের বিয়েতে সেও বরযাত্রী গিয়েছিল। শাঁখপুরের কথা তার আজও মনে আছে। শাঁখপুর নয় শঙ্খপুর। সেখানেই সে শুনেছিল—"শঙ্খের বাণিজ্য তথা নাম শঙ্খপুর"—আগে সেখানে শাঁখের কারবার ছিল। শঙ্খবণিকের মস্ত বন্দর। বণিকেরা কোনকালে লোপ পেয়েছে—তাদের জায়গায় ব্রাহ্মণেরা এখন বড় লোক। চাটুজ্জেরা তার মধ্যে একঘর। পাকা চকমিলেন বাড়ী, ঠাকুর দালান—কাছারী, ঘোড়া, গাড়ী—জমজমাট অবস্থা। বাড়ীর মেয়েদের পর্য্যন্ত সম্পত্তি দেয় চাটুজ্জে-বাবুরা। রাসুঠাকরুণের মা চাটুজ্জে-বাড়ীর এক অংশের মালিক। রাসু বউঠাকরুণ পর্য্যন্ত তার অংশ পেয়েছে। মুখুজ্জে কর্তার ভুল হয়েছিল, সায়রের মাছকে ডোবায় এনে ফেলেছিল সে। সে কি ডোবায় থাকে? না—থাকতে পারে! প্রথম বউ এসেই রাসু বউঠাকরুণের সে কি কান্না! উঃ!—মাটির বাড়ীতে আমি কি ক'রে থাকব? মাটির ঘরে সাপ থাকে! স্নানে যাবার পথে গ্রাম দেখে সে ভয়ে শিউরে উঠে কেঁদেছিল—এ যে ডাকাতে মেরে দেবে গো! এ যে চারিদিকে বনজঙ্গল!

শুনে লজ্জার আর সীমা ছিল না তাদের। কিন্তু রাসু বউঠাকরুণকে তারা দোষ দেয় নাই। দোষ দিয়েছিল মুখুজ্জে কর্তাকে। বিয়ের সম্বন্ধের সময় কর্তা নিশ্চয় নিজের অবস্থা লুকিয়েছিল। ফলে রাসু বউঠাকরুণ

পাল্কী থেকে মুখুজ্জে-বাড়ীর মাটিতে পা দিয়ে কেঁদে ফেলেছিল। তারপর ক্রমে তার কান্না থামল কিন্তু শান্ত হ'ল না। নদীর জল শুকিয়ে গেলে থাকে শুধু বালি, বৈশাখের বালির চর—আগুনের কুণ্ড হ'য়ে ওঠে; রাসু বউঠাকরুণ ঠিক তেমনি হ'য়ে উঠল। বৈকুণ্ঠের একদিনের কথা আজও মনে আছে। বিয়ের পরে অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে মুখুজ্জে-কর্তা বউ নিয়ে এল। বউ আনবার আগে মাটির বাড়ী মেঝে বাঁধালে—উঠোন বাঁধালে—মাটির দেওয়ালের উপরেই চূণের কলি ফেরালে; 'ভার-ভারোটা' নিয়ে রাসু বউ এল শ্বশুরবাড়ী। বৈকুণ্ঠ পরদিন সকালে গিয়েছিল মুখুজ্জেবাড়ী। উঠোনে গিয়ে সে দাঁড়িয়েছে—হঠাৎ অচেনা গলার ধমকে সে চমকে উঠল।

—এই হারামজাদা—এই!

বৈকুণ্ঠ এ পাশে তাকিয়ে দেখলে নতুন বউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে-ই বলছে—এই হারামজাদা এই! কিন্তু কাকে সে বলছে বুঝতে না পেরে চারিদিকে তাকিয়ে বৈকুণ্ঠ গালাগালির মানুষটাকেই খুঁজছিল। বউ আবার বললে—কে রে তুই? তুই কালা নাকি?

বৈকুণ্ঠ এবার প্রশ্ন করেছিল—আজ্ঞে মা, কাকে বলছেন?

—তোকেই রে হারামজাদা। আবার কাকে?

বৈকুণ্ঠ হতভম্ব হ'য়ে গিয়েছিল।

—একেবারে অন্দরের মধ্যে এসে ঢুকলি যে? ব্রাহ্মণের বাড়ীর—ভদ্রলোক বাড়ীর অন্দর—ছোট লোক কোথাকার!

রাসু-বউয়ের ননদ এসে পড়েছিল এর মধ্যে, সে বলেছিল—কাকে কি বলছ বউ! ও আমাদের বৈকুণ্ঠ!

—বৈকুণ্ঠ না গোলক না কৈলেশ সে আমি জানি। ছোট জাত ছুঁলে চান করতে হয়—অখাদ্য কুখাদ্য খায়—গায়ে গন্ধ, ওরা যেখানে দাঁড়ায় সেখানটা নরক হ'য়ে ওঠে বলেই জানি। আপনাদের এখানে অন্দরে ছোট লোক ঢোকে নাকি?

রাসু-বউয়ের শাশুড়ী এবং বৈকুণ্ঠ দু'জনেই হতবাক হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। কথাটা কিন্তু কাণে গিয়েছিল মুখুজ্জে-কর্তার। খট-খট শব্দে খড়ম প'রে কোঠার উপর থেকে তিনি নেমে এসেছিলেন। বলেছিলেন—বাইরে যা বৈকুণ্ঠ—বাইরে যা।

* * * *

রাসুঠাকরুণ নিজেও আজ এই কথাগুলি ভাবছিল।

তার দোষ ছিল না। পনেরো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল—ষোল বছরে সে এসেছিল শ্বশুরবাড়ী। তার আগে পর্যন্ত রাসু তার মামার বাড়ী শঙ্খপুরের চাটুজ্জে-বাড়ীতে এই ধারাধরণ এমনি কথাবার্তাই শুনে এসেছে। তার বড়মামী বলতেন—ছোট লোক থাকবে জুতোর তলায়।

একদিন কে বলেছিল—কিন্তু ওরাও ত মানুষ—ভগবানের কাছে—

মামী বলেছিল—ভগবানের কাছে? ভগবানের সঙ্গে ওদের কি সম্বন্ধ?

—সে কি?

—সে কি আবার কি? ভগবানের মন্দিরে ভগবান ওদের ঢুকতে দেয়? ভগবানকে ছুঁতে পারে? ভগবান!

বড়মামীকে অত্যন্ত ভয় করত রাসু।

বড়মামীর চেহারা ছিল রাণীর মত, তেমনি ছিল কথাবার্তা। মামাতো বোন শ্যামা রাসুর ছ-সাত বছরের ছোট; শ্যামাকে সে ভারী ভালবাসত। তার ঝকঝকে জামা, তকতকে বিছানা, রঙচ'ঙে নানা রকমের খেলনা দেখে সে তার কাছেই অহরহ ঘুরঘুর করত, তাকে আদর করতে যেত, বলত—বোনটি-বোনটি-বোনটিরে!

বড়মামী ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসত। বেশী একটু কাছে ঘেঁষে গেলেই বলত—যা—যা—বাইরে যা। ক্যাঙলামী হ্যাংলামী ভাল লাগে না আমার, যা।

ভয়ে ভয়ে রাসু চ'লে আসত। কোনদিন মামী ডেকে বলত—দাঁড়া। তারপর শ্যামার একটা ভাঙা খেলনা হাতে দিয়ে বলত—যা, এটা নিয়ে যা।

রাসু খেলনাটা না নিয়ে পারত না, কিন্তু তবু যেন কেমন মনে হ'ত।

কোনদিন মামী বলত—যা পছন্দ করি না তাই। আমি চেষ্টা করলে কি হবে, এ বাড়ীর ধারাধরণই যে.আলাদা। মেয়েকে সম্পত্তি দিয়ে ঘরে রাখা, ছি !

রাসু সিঁড়িতে নেমেও দাঁড়িয়ে শুনত অবাক হ'য়ে। কথাগুলো সে স্পষ্ট বুঝতে পারত না, তবুও অস্পষ্টভাবে মনে হ'ত—মামী কথাগুলো বলছে তার মা এবং তাকে লক্ষ্য ক'রে। কথাগুলোর ঝাঁঝ এসে তার মনে একটা অস্বস্তিকর স্পর্শবোধ জাগিয়ে তুলত। মনে হ'ত নিজেকে অপরাধী। কান্না পেত, ভয় হ'ত।

রাসুর ছোটমামী ছিল গরীবের ঘরের মেয়ে। রাসুর শোনা কথা। নইলে ছোটমামীর ঘরদোর কাপড় গয়নার বাহার বড়মামীর চেয়ে কিছু কম ছিল না। বড়মামী বলত—ছোটঘরের মেয়ে। শুধু বড়মামী নয়—রাসুর মাও বলত—ছোটঘরের মেয়ে।

রাসুর মা বড়ভাজকে এড়িয়ে চলত, ছোটভাজকে কথা বলত ঘুরিয়ে বেঁকিয়ে। একটা কথা রাসুর মনে আছে। অবিকল কথাগুলি মনে মনে সে আবৃত্তি করতে পারে। চোখের সামনে বড়মামী, ছোটমামী ও তার মায়ের সেদিনকার চেহারাগুলি ভেসে ওঠে।

ভিজে সিমেণ্ট-করা উঠোনে ছোটমামীর পা পিছলে গিয়েছিল। রাসুর মা তাড়াতাড়ি গিয়ে তাকে হাত ধ'রে তুলে বলেছিল—আহা-হা ! ওঠ, ওঠ ভাই। পড়ে গেলে ! লেগেছে ?

ছোটমামীর বেশ খানিকটা লেগেছিল, কিন্তু তবু ছোটমামী হাসতে হাসতে বলেছিল,— না—লাগেনি।

রাসুর মা বলেছিল—সিমেণ্ট-করা উঠোন—মেঝেতে চলা অভ্যেস নেই, একটু সাবধানে চলতে হয়।

ছোটমামী রাসুর মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ ; ছোটমামীর

চোখের সে চাউনি রাম্বর আজও মনে আছে। তারপর বলেছিল—তোমার শ্বশুরবাড়ীর উঠোন পাকা না কাঁচা ঠাকুর ঝি ?

রাম্বর মা দপ্ ক'রে জ্বলে উঠেছিল; রাম্বরও রাগ হয়েছিল ভয়ঙ্কর; একটা অঘটন সেদিন ঘটত। কিন্তু বড়মামী এক কথায় সমস্ত ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছিল। বড়মামী বলেছিল—শ্বশুরবাড়ীর উঠোনের কথা ঠাকুরঝিকে ভাবতে হয়নি ছোটবউ। ঠাকুরঝি এ বাড়ীর একটা অংশীদার। পাকা উইল ক'রে শ্বশুর ওঁকে বাড়ী-ঘর পুকুর জমিদারীর অংশ দিয়ে গেছেন।

ছোটমামীর মুখখানি অতিসুন্দর মুখ, সে-মুখ ঐ এককথায় একমুহূর্তে কাল হ'য়ে গিয়েছিল। একটি কথাও আর তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে নাই। বড়মামীর একটা ভারী চমৎকার চাল ছিল, এমনি ধারার কথা ব'লে সে আর সেখানে দাঁড়াত না, সঙ্গে সঙ্গে চ'লে যেত, কখনও কখনও কয়েক পা গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আবার একটা কথা বলে চ'লে যেত। তার ফলে কথাগুলোর জ্বালা—শাসন—অনেকগুণ বেড়ে যেত। সেদিনও বড়মামী কথাগুলো বলেই দরদালানের দিকে চ'লে গিয়েছিল, দরজার মুখে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল—এ বাড়ীর কথাবার্তার একটা হিসেব আছে, ছোটবউ, সে হিসেবটা তুমি বরং ঠাকুরপোর কাছে জেনে নিয়ো।

ঠিক তার পরমুহূর্তে বড়মামী দরজার মধ্যে দিয়ে যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

ছোটমামীও কিন্তু হিসেবটা শিখেছিল—এর পর অত্যন্ত নিখুঁত ভাবে। কড়া-ক্রান্তি মিলিয়ে হিসেব ক'রে কথা বলতে, এমন কি পা ফেলত পর্যন্ত হিসেব ক'রে। কয়েক দিন পরেই, রাম্বর মা আর বড়মামী দু'জনে ওই ছোটমামীর বেহিসেবী আচরণের চর্চা করছিল। চর্চাটি বেশ উপভোগ্য এবং সরস হ'য়ে উঠেছিল,—যার ফলে দু'জনে সাময়িকভাবে হ'য়ে উঠেছিল ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ। বড়মামী নিজের রূপোলী রাংতা-মোড়া জর্দা খানিকটা নিজে মুখে পুরে খানিকটা ননদের হাতে দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে

দেয়ালের গায়েই খানিক পিচ ফেলে বলেছিল—পিচ ফেল ঠাকুরঝি, হাসতে গিয়ে বিষম খাবে।

রাসুর মা'ও সঙ্গে মঙ্গে পিচ ফেলে বলেছিল, বিষম খেতে বাঁচলাম কিন্তু পেট যে ফেটে যাচ্ছে। মা—গো—মা!

ঠিক সেই মুহূর্তে উপর থেকে নামছিল ছোটমামী। রাসুদের পাশ কাটিয়ে নিচে নেমে গেল। কয়েকটা সিঁড়ি নেমেই সে তীক্ষ্ণ উচ্চকণ্ঠে বললে—কে বেয়াদপ—বেতরিবত এমন ক'রে দেয়ালের গায়ে পিচ ফেললে রে? কে? কে?

বড়মামী ফোঁস ক'রে ফিরে দাঁড়াল।—ছোটবউ!

ছোটমামী গ্রাহ্যও করেনি; বলেছিল—ছি! ছি! এমন ছোটলোকী নোংরামী আমি আর দেখিনি! ছি! ছি!

বড়মামী চীৎকার ক'রে উঠেছিল—ছোটবউ!

—কি দিদি? ছোটমামী আশ্চর্য হ'য়ে গিয়েছিল যেন!

রাসুর মা বলেছিল—হিসেব ক'রে কথা বল ছোটবউ! কাকে কি বলছ?

কি বলছি? ছোটমামী আরও আশ্চর্য হ'য়ে গেল এবার। দেখ না কি ছোটলোকী নোংরামী, দেয়ালের গায়ে পানের পিচ—।

—পিচ ফেলেছি আমি আর ঠাকুরঝি!

অত্যন্ত বিনয় ক'রে হেসে এবার ছোটমামী বলেছিল– যেই ফেলে থাক দিদি, পিচটা বেহিসেবী ফেলা হয়েছে। সিঁড়ির কোণে কোণে পিচ ফেলবার জন্যে মাটির মালসাগুলো রাখা আছে, সেগুলো হিসেব ক'রেই রাখা হয়েছে।

বড়মামী কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হ'য়ে থেকে অকস্মাৎ রাগে যেন ফেটে পড়েছিল—জান তুমি, আমি এ বাড়ীর মালিক, ঠাকুরঝিও তাই!

ছোটমামী বলেছিল—জানি বড়দি, তুমি আট আনার মালিক—আমি

আট আনার মালিক, যেখানটায় পিচ ফেলেছ সেখানটাতেও আমার আট আনা অংশ আছে। ঠাকুরঝির এ সিঁড়িটায় অংশ নাই, তাঁর শুধু তিনখানা ঘর, তাও একতলায়,—চৌহদ্দি ক'রে দেওয়া আছে, কেবল উঠোনটায় অংশ আছে।

বড়মামীর মুখে আর কথা ফুটতে পারে নাই। রাসুর মায়ের মুখ সাদা হ'য়ে গিয়েছিল। রাসুর হাত-পা ঘামছিল—গলার ভেতরটা শুকিয়ে আসছিল —মনে হচ্ছিল সে হয় তো প'ড়ে যাবে।

ছোটমামী বলেছিল—এমন বে-হিসাবী কথা তুমি বলবে বড়দি, এ আমি ভাবিনি। ব'লেই সে বড়মামীর মত চ'লে যায় নি, ফিরে উঠে এসে বড়মামী এবং রাসুর মাকে প্রণাম ক'রে বলেছিল - মনে যেন দুঃখ ক'র না বড়দি। হিসেবের কথা একটু শক্তই হয়। তারপর সে চ'লে গিয়েছিল— নিচেই নেমে গিয়েছিল। রাসুর মনে হয়েছিল বড়মামীর চ'লে যাওয়ার চেয়ে ছোটমামীর প্রণাম করাটা আরও ভাল হয়েছে। ওই শঙ্কিত অবস্থার মধ্যেও এটুকু তার মনে হয়েছিল—সে দিকে তার একটা চতুর দৃষ্টি সজাগ ছিল।

ও বাড়ীর হিসেব রাসুও ক্রমে ক্রমে শিখে নিয়েছিল; রাসুর মাতামহ মেয়েদের বিয়ে দিয়েছিলেন উজ্জ্বল কুলীনের ছেলে দেখে; প্রত্যেক মেয়েকে দিয়েছিলেন নিচের তলায় তিনখানা ক'রে ঘর, উঠোনের অধিকার, ত্রিশ বিঘে হিসেবে জমি, বার্ষিক একশো টাকা মুনাফার জমিদারী। খিড়কীপুকুরে এক আনা অংশ আর সব ক'টি কন্যাকে একটি ষোলআনা পুকুর। মাছ ভাগের হিসেবটা সর্বাগ্রে বুঝেছিল রাসু। মাছ যখন ধরা হ'ত তখন সেখানে গিয়ে পাহারা দিত তার দাদা, বাড়ীতে যখন ভাগ হ'ত তখন থাকত রাসু। ক্রমে রাসু আবিষ্কার করেছিল--সিঁড়িতে তাদের অংশ না থাকলেও ছাদে যাবার জন্য সিঁড়ি ব্যবহারের তাদের অধিকার আছে। দেওয়ালে পিচ ফেলাতে.

হকদার না হ'লেও পায়ের নখের ঠেলায় ফাটা পলেস্তারা উঠিয়ে দিলে কেউ কিছু বলতে পারে না। আরও একটা হিসেব সে জানলে। বাড়ীর মধ্যে তার মা মামীদের চেয়ে ছোট হলেও বাড়ীর বাহিরে পা বাড়ালেই তার মা হ'য়ে ওঠে বড়। তার মা এবং মাসীরাই তখন আগে আগে চলে, মামীরা ঘোমটা টেনে চলে পিছনে; তার মা এবং মাসীরাই তখন হুকুম করে, মামীরা শোনে। কিছুদিন পরে সে অর্থাৎ রাস্নু যখন বড় হ'ল—তখন মধ্যে মধ্যে রাস্নুও যেত তার মা-মাসীর স্থলাভিষিক্ত হ'য়ে। সে একটা গৌরব অনুভব করেছিল রাস্নু। তারপর হঠাৎ একদিন—সে দিনের কথা রাস্নুর মনে হ'লে সর্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধ'রে ওঠে।

গাঙ্গুলী বাবুদের বাড়ী নেমন্তন্ন, অন্নপূর্ণা পূজোর উপলক্ষ্যে সমারোহ ব্যাপার। রাস্নুই গিয়েছিল মামীদের নিয়ে। রাস্নুর বয়স তখন বারো।

রাস্নুর খবরদারীর আতিশয্যে বিরক্ত হ'য়ে গাঙ্গুলীদের মেয়ে নলিনী জিজ্ঞেস করেছিল—এটি জ্ঞানো দির মেয়ে না? রাস্নু নাম বুঝি?

—হ্যাঁ। ব্যাঙাচির তবু লেজ খসে নি। কথা শোন না। এমন ভাবে তাকিয়ে ছিল বড়মামীর তার দিকে।

নলিনী পিসী বলেছিল—যাও রাস্নু, ঠাকুর দেখে এস।

রাস্নু শিউরে উঠেছিল—পুরুষদের হাটের মধ্যে সে ঠাকুর দেখতে যাবে কি?

নলিনী বলেছিল—তোমরা ঝি সঙ্গে ক'রে এলেই পার।

—তাই আসব এবার ভাই। জ্বালাতন! যা না তুই রাস্নু এখান থেকে। তুই আপনার খেয়ে দেয়ে চলে যাস। আমরা এখান থেকে ঝি সঙ্গে ক'রে যাব।

ব'লে আবার বলেছিল—ঝি নিয়ে এলে যজ্ঞি বাড়ীতে খাওয়া-দাওয়ার মধ্যে ছুত ছোঁয়া পড়ে, তাই ওদের সঙ্গে আনি। তা' কথা দেখ না!

ছোটমামী টিপ্পনী কেটেছিল—এটা তুমি অন্যায় বলছ বড়দি। যে দারোয়ান হাঁক-ডাক করতে জানে না তাকে নিয়ে বেরিয়ে লাভ নেই।

রাসুর সর্বাঙ্গ' ঝিম-ঝিম ক'রে উঠেছিল। সে ঠাকুর দেখতে যায় নাই, খেতেও যায় নাই, একটি থামের আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। অবশ্য আড়ালে না থেকে সামনে থাকলেও এসব কথার কোনটাই মামীদের জিভে আটকাত না।

তবু কত মায়া কত নাড়ী-ছেঁড়া টান তার ওই বাড়ীখানির ওপর ছিল। বাড়ীখানার প্রতিটি কোণ আজও তার চোখের উপর ভাসছে। গরমের দিন সন্ধ্যের সময় উঠানে শোয়া, খাওয়া-দাওয়ার পর ছাদে শোয়া, শীতের সময় উনোনের পাশে একফালি জায়গায় শুয়ে কত আরাম—সে আরাম ও বাড়ী ছেড়ে এ জীবনে আর মিলল না। তাই সে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী এসে কেঁদেছিল। শুধু বাড়ীই নয়, বড়মামী ছোটমামী বড়মামা ছোটমামা এদেরই সে কি কম ভালবাসত? নইলে সে নিজেই তো তার মাকে বলেছিল—মা উড়ো কুলীন দেখে আমার বিয়ে দিয়ো না। তোমার বাপের বাড়ী ভাইয়ের বাড়ী, আমার তো তা নয়। এ বাড়ীতে তোমার দশাই ঝি-চাকরের মত, আমাকে যে ভিখেরী হ'য়ে থাকৃতে হবে মা!

কুলীনের মেয়ে, বয়স তখন পনেরো পার হ'য়ে গেছে; মামাদের পোষ্য সে কথা স্পষ্ট বুঝেছে; পল্লীগ্রামের প্রাচীন আমীরপন্থী জমিদার বাড়ীতে মানুষ হয়েছে—বয়সের চেয়ে অনেক বেশী কথা শিখেছে। মাকে কথাগুলো বলতে তার এতটুকু বাধে নাই। তাই এ বাড়ীতে তার বিয়ে হয়েছিল।

রতনহাটির রামময় মুখুজ্জে শঙ্খপুরে যেত তার জমিদারীর মুনাফা আদায় করতে। গাঙ্গুলীবাবুদের কাছে বছরে খাজনা পাওয়া যায় আটষট্টি টাকা তের আনা ছ'গণ্ডা দু'কড়া। মুখুজ্জে ছিল এক রাজবাড়ীর গমস্তা। তা থেকে আরম্ভ করেছিল অল্পস্বল্প সুদি কারবার। শঙ্খপুরে গিয়ে মুখুজ্জে অতিথি হ'ত চাটুজ্জে বাড়ীতে। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গায়ে পিরাণ,

ভারিক্কি চেহারা ছিল মুখুজ্জের, রাজবাড়ীর গমস্তা হিসেবে আদব-কায়দাও জানা ছিল তার, তাই আটষট্টি টাকা মুনাফা হলেও জমিদার ব'লে খ্যাতি ও খাতির অর্জন করেছিল সহজেই। চাটুজ্জে এ বাড়ীর ভাগ্নীর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিয়ে অভিজাতদের জাতে উঠবার প্রলোভনও সামলাতে পারে নাই। তার উপর মুখুজ্জে ভঙ্গ হ'লেও কুলীন ছিল। তাই এ ক্ষেত্রে রাসুর বিবাহ ঘটে গিয়েছিল মুখুজ্জের একমাত্র পুত্রের সঙ্গে।

রাসু পুলকিত হয়েছিল। সেও হ'ল জমিদার বাড়ীর বউ। বড়মামী ছোটমামীর হেনস্তা সে আর সহ্য করবে না। সেইখানেই সে কাটিয়ে দেবে সমস্ত জীবন—সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্নার মধ্য দিয়ে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, রাসু কিছুতেই তা' পারলে না। আজও ভেবে সে কুল-কিনারা পায় না কেন তার এমন হয়েছিল, কেন সে এমন করেছিল! এ বাড়ীর প্রতিটি জন তাকে প্রথম দিনের প্রথম ক্ষণ থেকেই প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের ভালবাসার ধারাধরণটা রাসুর হয়তো ভালো লাগে নাই। সে আজও বুঝতে পারে না, এই মুহূর্তেও বুঝতে পারছে না। ক্ষুদ্র একটি ঘটনাকে উপলক্ষ্য ক'রে ব্যাপারটা ঘটেছিল। দুর্বোধ্য অর্থহীন ব্যাপারটা ঘটেছিল। দুর্বোধ্য অর্থহীন ব্যাপারটাব মধ্যে শুধু গোড়াকার ঘটনাটুকু স্পষ্ট। সে কাঁদছিল। বিয়ের আগে এ বাড়ীর জন্য কত কামনাই না সে করেছিল—তবু কাঁদছিল মায়ের জন্য, ভাইয়ের জন্য, গাঁয়ের জন্য, বাড়ীর জন্য, মামাদের মামীদের জন্যও—হ্যাঁ সে তাদের জন্যও কাঁদছিল। সকল নতুন বউ যেমন শ্বশুরবাড়ী গিয়ে কাঁদে তেমনিই সে কাঁদছিল। আর কিছু না। তার ননদ ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে তাকে কাঁদতে দেখে হেসে বলেছিল—কাঁদছ ভাই! ছি কেঁদোনা। এই তোমার ঘর, এখানেই তোমাকে থাকতে হবে।

রাসু তবু থামে নাই। ননদ তার হাত ধ'রে বলেছিল—উঠে এস, বাইরে চল।

রাসু হাতখানা টেনে নিয়ে খানিকটা স'রে একটা কোণে গিয়ে বসেছিল। ননদ বলেছিল—ওখানে না ভাই, কোণটায় একটা গর্ত রয়েছে, স'রে বস।

চমকে উঠেছিল রাসু। গর্ত! সাপ আছে! মাটির বাড়ীতে যে সাপ থাকে।

ননদ শুনে একেবারে হেসে আকুল।—অ বাবা! শোন শোন তোমার বউ কি বলছে শোন!

—কি বলছে? শ্বশুর বাইরেই ছিল, তার কণ্ঠস্বরে স্নেহ-প্রসন্নতার আভাস. রাসু স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিল।

ননদ বলেছিল—বউ বলছে, মাটির বাড়ীতে যে সাপ থাকে। তুমি এবার পাকা বাড়ী কর বউয়ের জন্যে।

শ্বশুর তবুও রাগে নাই, বলেছিল—তা' আজন্ম পাকা-বাড়ীতে থেকেছেন, বড়ঘরের মেয়ে,—আর কথাটাও সত্যি, মাটির ঘরে সাপ থাকেও তো। তা' এবারই ঘরদোরের মেঝে বাঁধিয়ে ফেলব। আর মা লক্ষ্মীর পয় থাকলে পাকা-বাড়ীও হবে!

রাসু নিজেকে গৌরবান্বিত বোধ করেছিল।

ননদ বলেছিল—ওই শুনলে তো! তা ভাই তোমার দৌলতে আমাদের দুঃখ ঘুচল, সকালে উঠে আর গোবরমাটির গোলা দিয়ে ঘর নিকুতে হবে না। ওঠ, চল—স্নান ক'রে আসি।

স্নানে যাবার পথে গ্রামের জঙ্গল দেখে তার ভয় হয়েছিল। বলেছিল—কি জঙ্গল! মা গো! এ যে দিনে ডাকাত লুকিয়ে থাকবে গো!

তার ননদ সে কথাটা সকৌতুকে প্রচার করেছিল বাড়ীতে, গ্রামে।—বউ আমাদের জঙ্গল দেখে ভয়ে কেঁদেছে!

সগৌরবে স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে সে ফিরে এসেছিল মামার বাড়ী। পথে তার দাদা বলেছিল—মামীদের বলবি পাকা-বাড়ী, বুঝলি রাসু!

কথাটা বুঝতে রাসুর দেরী হয় নাই। এবং এর ফলে বড়মামী ছোটমামীর

কাছে যে সম্ভ্রম সে পেয়েছিল—তাতে তার মনে যে তৃপ্তি পেয়েছিল সে স্মরণ ক'রে আজও সে অন্তরে অন্তরে আনন্দ অনুভব করে। আজও তার মনে আছে।

ছোটমামী হেসে বলেছিল—রাসুর চলার ধরণ পাল্টেছে, দেখেছ দিদি ?

বড়মামী বলেছিল—নদীর জল গঙ্গায় পড়লেই গঙ্গার জল হয়, তার রঙ পর্যন্ত পাল্টে যায়। তোমার নিজের কথাই ভেবে দেখ না।

ছোটমামীর মুখ লাল হ'য়ে উঠেছিল। রাসুর কিন্তু লজ্জা হয়েছিল।

বড়মামী গ্রাহ্য করে নাই। রাসুকে জল খেতে দিয়ে বলেছিল—হ্যাঁ রে, তোর শ্বশুরের জমিদারীর আয় কত রে ?

রাসু উত্তর দিতে পারে নাই। মুখ তার শুকিয়ে গিয়েছিল। উত্তর দিয়েছিল ছোটমামী—আয় বেশী নয় উনি বলেছিলেন। তবে রাসুর শ্বশুরের নাকি টাকা আছে অনেক। অনেক বড় সুদি কারবার।

রাসু কিছুই জানত না, তবুও সে বলেছিল—লোকে শ্বশুরকে বলে টাকার কুমীর।

টাকার কুমীর ?

সঙ্গে সঙ্গে বড়মামী ছোটমামী দু'জনের চোখেই যে দৃষ্টি ফুটে উঠেছিল সে দেখে তার মন বিচিত্র তৃপ্তিতে আনন্দে ভ'রে উঠেছিল। বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজোয় বলিদানের সময় পাঁঠাগুলোর চোখ এমনি বড় হ'য়ে ওঠে, চোখের তারা এমনি স্থির হয়ে যায় !

সমস্ত জীবনে বড়মামী ছোটমামী তার কাছে টাকা চাইতে এলে সে কখনও ফিরিয়ে দেয় নাই। গোপনে নিজের গহনা বন্ধক দিয়ে এমন কি বিক্রি ক'রেও সে তাদের টাকা দিয়েছে। ছোটমামী বড়মামীর চোখে ওই চাউনী দেখবার জন্যেই তার ইচ্ছে হ'ত সে এখানে থাকে। তার উপর শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে সেখানে থাকতে না চাইলে ননদ শ্বশুর স্বামীর চোখে এমন ধারার অসহায় দৃষ্টি ফুটে উঠত যে, তাতেই শ্বশুরবাড়ীতে থাকতে না চাওয়ার জেদটা আরও প্রবল হ'য়ে উঠত।

শ্বশুর বিরক্ত হয়েও বলত—অন্যায় করেছি—মহা অন্যায় করেছি—বড়ঘরের মেয়ে এনে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি। হাতে তুলে অখাদ্য খেয়েছি। এ হ'ল তার ফল ভোগ।

একটা বিচিত্র আনন্দ হ'ত রাসুর। বাইরে থাকত রাগ-ভয়, কিন্তু ভিতরে একটা আনন্দ।

স্বামীর কথা মনে হ'লে তার মন বিষিয়ে ওঠে। অক্ষম অপদার্থ রুগ্ন, বিনিয়ে বিনিয়ে কথা বলত, সে নাকি ছিল লেখাপড়া জানা লোক! পাশের গাঁয়ের ইস্কুলে মাষ্টারী করত।

বিয়ের পর প্রথম যেদিন সে স্বামীকে নিয়ে শঙ্খপুরে গিয়েছিল, সেদিন রাত্রে কাছারী বাড়ী থেকে এসে সে কেঁদেছিল। রাসু অবাক হ'য়ে গিয়েছিল। সে বলেছিল—কালই আমি বাড়ী যাব।

—কেন?

সে রাসুর মুখের দিকে চেয়ে বলেছিল—তোমার দাদা ছোটমামা মদ খায়—আমাকে মদ খেতে বলেছিল।

এর চেয়ে বিস্ময়ের কথা রাসু জীবনে শোনে নাই। মদ খেতে বলেছে তো কি হয়েছে? মদ খাবে। পুরুষ মানুষ তো সবাই মদ খায়। জমিদার বাড়ী—ব্রাহ্মণ শাক্তের বাড়ী মদ তো সবাই খায়। তোমরাও তো জমিদার—শাক্ত!

সে কিন্তু সে-কথা শোনে নাই। যে কয়েকদিন ছিল শঙ্খপুরে চুপ ক'রে বসে থাকত' ঘরের মধ্যে। বাইরে গেলে অল্পক্ষণ পরেই এসে আবার ঘরে ঢুকত। রাসুর দাদা অট্টহাসি হাসত। ছোটমামা মুচকি হাসি হাসত।

আজ দীর্ঘকাল পরে তাকে মনে ক'রে রাসুঠাকুরুণের চোখে জল ভ'রে এল। বেলা গড়িয়ে এসেছে, সূর্য হেলে পড়েছে গ্রামের পশ্চিমের দিঘীটার পাড়ের তালগাছের সারির আড়ালে। লালচে রোদ গাছের মাথায় ঝলমল করছে। রাসুর মনও ঠিক এমনি হ'য়ে উঠেছে।

সে মৃত্যুর সময় রাসুকে বলেছিল—তুমি যেন খোকাকে নিয়ে শঙ্খপুরে যেয়ো না। এইখানেই থেকো। নইলে—। সকরুণ হাসি ফুটে উঠেছিল তার মুখে।

রাসু তার কথা রাখে নাই। কলেরায় ক'দিন আগে শ্বশুর মরেছিল, ক'দিন পরেই মারা গেল স্বামী। ননদ তার আগেই চলে গিয়েছিল—নিজের শ্বশুরবাড়ী দেওরের আশ্রয়ে।

আজ একটা দীর্ঘনিশ্বাস যেন আপনি বেরিয়ে এল রাসুঠাকরুণের বুক থেকে। অতীত যেন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। স্বামীর মৃত্যুশয্যা চোখের সামনে ভাসছে তার। বিধবা হয়ে শঙ্খপুরে ফিরে যাচ্ছে সে। মা কাঁদছে—বড়মামী, ছোটমামী দাঁড়িয়ে রয়েছে।

* * * *

বৈধব্যের মধ্যে গৌরব বাড়ল রাসুর।

সে কি সমাদর, সে কি সম্ভ্রম !

মা বুকফাটা চীৎকার ক'রে কাঁদছিল। রাসুর খোকাটি ব'সে ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চারিদিকে চেয়ে দেখছিল। রাসু নীরবে পড়েছিল দাওয়ার উপর। বড়মামা এল। গম্ভীর মানুষ, বললে—কেঁদো না দিদি। ভবিতব্যকে না মেনে তো উপায় নাই। নিজের মেয়েকে বুকে তুলে নাও। তাকে সান্ত্বনা দাও। নাতির মুখের দিকে চাও।

বড়মামী সঙ্গে সঙ্গে এসে রাসুকে উঠিয়ে বুকে চেপে ধ'রে বলেছিল—কাঁদিসনে মা,—চুপ কর।

ছোটমামী তুলে নিলে খোকাকে। ছোটমামা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ মুছে উঠে গেল। কিছুক্ষণ পরই ফিরে এসে ডাকলে রাসুর মাকে—দিদি। শোন!

—রাসুর সঙ্গে যা জিনিষপত্র এসেছে, মানে গয়নাপত্র টাকাকড়ি—সেগুলো তুলে রাখা হয়েছে কি না দেখ।

মা কেঁদে উঠেছিল—জানি না ভাই, ওসবে আমার কাজ নাই রে, আমার কাঞ্চন চলে গেছে রে—কাচের হিসেব করতে ব'ল না আমাকে ভাই রে—

—আ! চেঁচিও না। দাদা বলে দিলে। সব দেখে শুনে তুলে রাখ।

রাসু নিজেই সচকিত হয়ে উঠল। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলে। এই যে একেবারে পাশেই তার ট্রাঙ্কটা। এরই মধ্যে আছে তার গহনার বাক্স, টাকা, দলিল-পত্র। স্তব্ধ হয়ে সে বসেছিল। সর্বাঙ্গ তার সাদা চাদরে ঢাকা। চাদরের আবরণের মধ্যেই সে সন্তর্পণে হাত বাড়ালে, বাক্সের তালাটা টেনে দেখলে। নাঃ, ভুল হয় নাই, শক্ত তালাটাই দেওয়া আছে। চাবীও ঠিক দেওয়া হয়েছে।

—একটু সর তো রাসু। বাক্সটা তুলে রাখি।

রাসু চমকে উঠলো। কথাটা বললে তার দাদা। রাসু চঞ্চল হয়ে উঠল। তবুও তাকে সরে বসতে হ'ল। রাসুর বড় মামী বললে—বাক্সটা ভেতরে রেখে দিক মা। সরে আয়।

কয়েক মুহূর্ত পরেই রাসু বললে—আমার শরীরটা খারাপ করছে মামী, আমি ভেতরে গিয়ে শোব।

বড়মামী বললে—চল ওপরে চল। এখানে ভিড়, তা ছাড়া হাওয়া নাই, ওপরে নিরিবিলি থাকবি, চল।

—না। বলেই রাসু উঠে তার মায়ের ঘরের মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়ল।

তার দাদা তখনও বাক্সটাকে খাটের নিচে ভিতরের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, সে বললে—দাঁড়া, দাঁড়া, বিছানার চাদরটা পাল্টে দিক। বড্ড ময়লা।

—থাক।

রাসু ওই ঘরের মধ্যে শুয়ে থাকে। সাধ্যমতে বাইরে আসতে চায় না, অনুরোধ করলে বলে—বেশ আছি। খোকাকে নিয়ে যায় ছোটমামী। ছোটমামী মাঝে মাঝে তাকে খেলনা পর্য্যন্ত দেয়, রহস্য ক'রে বলে—ছোট বর।

খোকা বলে—উঁ!

—ও মা গো! কোথায় যাব আমি। বলতে না বলতে রাজী! কিন্তু বিয়ে তো শুধু হয় না বর; টাকা দিতে হবে, গয়না দিতে হবে।

—দোব।

রাসু হঠাৎ ছেলের পিঠে একটা চড় বসিয়ে দেয়—বাপরে! কি নখের ধার! চিমটি কেটে আমার রক্ত বের ক'রে দিলে!

বড় মামী আসে; সে এসে রাসুকে টেনে বের করে বাইরে দাওয়ার উপর। রাসুর চুল খুলে আঙুল চালিয়ে জট ভাঙে, তারপর চিরুণী দেয়। গল্প করে।

গল্প আরম্ভ হয় যে কোন কথায়, শেষ হয় কিন্তু এক নির্দিষ্ট প্রসঙ্গে। শ্যামার বিয়ে। বড় মামীর মেয়ে শ্যামা। বয়স ষোল পার হয়ে গিয়েছে। মুরশিদাবাদের পাত্র চেয়েছে ছ' হাজার টাকা; রামনগরের পাত্রের দাবী সকল অঙ্গে দু'খানা ক'রে গহনা, পাত্রাভরণ, নগদ দু'হাজার; হুগলীর পাত্র চায় সম্পত্তির একটা অংশ, তা ছাড়া গয়না বরাভরণ।

রাসু চঞ্চল হয়ে ওঠে। বড়মামী বলে—নড়িস নে রাসু! এই হয়ে গেছে।

রাসু স্থির হতে চেষ্টা করতে গিয়ে আরও খানিকটা চাঞ্চল্য প্রকাশ ক'রে ফেলে, হাসতে হাসতে বলে—সব চেয়ে ভাল পাত্রে শ্যামার বিয়ে দাও মামী। তোমাদের তো টাকার ভাবনা নাই।

বড়মামী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে হেসে বলে—আর জমিদারের দিন নাই মা, শুধু জমিদার যারা তাদের ভেতর ফাঁক হয়ে গিয়েছে। তোমার শ্বশুরের মত জমিদারী-মহাজনী দুই না থাকলে—এ কালে অচল।

—আঃ মামী—লাগছে, বাপরে, বাপরে—কি ধার তোমার চিরুণীর! উঁ আমার মাথা জ্বলে গেল বাপু! মামীর হাত থেকে চুলের গোছা টেনে নিয়ে সে নিজেই বেঁধে নেয় এলো খোঁপা। বড়মামী কিছু বলবার আগেই সে ডাকে—ছোটমামী, খোকাকে নিয়ে কোথায় গেলে?

তার পদক্ষেপের শব্দে সিঁড়ির খিলেনে ধ্বনি ওঠে। মনে হয় কোন

শক্তিশালী লোক পা ফেলছে। কয়েক মুহূর্ত পরেই তার হাসির শব্দ পাওয়া যায় ছোটমামীর ঘরে।

কিছুক্ষণ পরেই তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর শোনা যায়—না ছোটমামী, সে হবে না—সে আমি পারব না।

যেমন শব্দ ক'রে সে উপরে উঠেছিল—তেমনি শব্দ ক'রে সে নেমে আসে। বড়মামী—বসেই ছিল, রাসু বড়মামীকেই বলে—তুমিই বল বড়-মামী—আত্মীয়স্থলে দেনা-পাওনার কারবার কি ভাল? সে আমি পারব কি না। না বাপু!

বড়মামী উঠে যায়।

রাসু অকারণে বাকী দিনটা চীৎকার করে। তেমনি পদক্ষেপে গোটা বাড়ীটা মাড়িয়ে বেড়ায়। তার মা মাসীরা অবাক হয়ে গেল। এমন চীৎকার করা যায়—এমন হাঁটা যায় এ বাড়ীতে এ তারা ভাবতেও পারে নাই কখনও।

কয়েকদিন পর।

রাসু উদাস হয়ে বসেছিল। ছেলেটা বাইরে দাওয়ার উপর খেলা করছে। মধ্যে মধ্যে কাঁদছে। ছোটমামী কয়েকদিন থেকে আর খোকাকে নেয় না। বড়মামীও আসে নাই; নিচে অবশ্য আসে মধ্যে মধ্যে, উপরের বারান্দাতেও দেখা যায়, কিন্তু কথাবার্তা বড় বলে না। বড়মামীর চোখের চাউনিও পালটে গিয়েছে। রাসু উদাসদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল উঠানের ওপারে মূল বাড়ীটার দিকে। আগে একরকম ছিল, এখন হয়েছে অন্যরকম। দর-দালানে ঢুকবার বড় দরজাটার দুপালা পলেস্তায় খুদে-তৈরী দুটো সিংহ আছে। আগে সিংহ দুটোর দাঁতে লাল, গায়ে কেশরে-চোখে সাদা নীল রঙ দেওয়া ছিল। ভারী ভয় হ'ত রাসুর। এখন রঙ চটে গিয়েছে—তার উপর পড়েছে শেওলা;—কালো শেওলার মধ্যে ও দুটোকে আর চেনাই

যায় না। অনেকক্ষণ সে দুটোর মধ্যে তাকিয়ে রাসু ঐ শেওলার আবরণের মধ্যে থেকেই তাদের পুরানো চেহারা দেখতে পেলে।

ঠিক এই মুহূর্তেই ভেতর থেকে বেরিয়ে এল নবীন স্বর্ণকার। পিছনে বড়মামী। শ্যামার গহনা তৈরী হচ্ছে বোধ হয়।

বড়মামী বললেন—চুড়ির পালিশ কিন্তু কলকাতা থেকে ক'রে এনে দিতে হবে।

রাসু হেসে বললে—কি প্যাটার্ণ চুড়ি গড়তে দিলে বড়মামী?

বড়মামী বললে—ফুল, মাকড়ী—এ দুটোর প্যাটার্ণ ও বাড়ীর নলিনী ঠাকুরঝির কাছে যাও, তিনি দেখিয়ে দেবেন। ঠিক অমনি হওয়া চাই কিন্তু। নইলে আমি ফেরৎ দেব।

রাসু আবার বললে—টকটকে লাল পাথর দেওয়া ফুল গড়তে দাও মামী। শ্যামাকে খুব ভাল মানাবে।

বড়মামী বললে—কুড়িদিন সময় নিয়েছ, মনে থাকে যেন।

নবীন প্রণাম ক'রে বললে—বেশ। আমাকেই কিন্তু সব গয়না দিতে হবে।

বড়মামী পানের পিচ ফেলে বললে—খুসী করতে পার, কথা রাখ, দেব না কেন? একুশ দিনের দিন আমি দারোয়ান পাঠাব কিন্তু। বলেই বড়মামী পিছন ফিরে ভেতরে চলে গেল।

নবীন চলে যাচ্ছিল। রাসু ডাকলে—নবীন!

—দিদি ঠাকরুণ। সম্ভ্রমভরে প্রণাম করলে নবীন।—বলুন কি বলছেন?

রাসুর কি মনে হ'ল, সে বললে—সোনার দর কি নবীন?

—খোকার জন্যে কিছু গড়াবেন দিদি ঠাকরুণ?

—না আমার গয়নাগুলো বেচে দেব।

—বেচে দেবেন? কেন? নবীন আশ্চর্য হয়ে গেল।

—কি হবে? নগদ টাকা সুদে বাড়বে।

হেসে নবীন বললে—আপনার শ্বশুর তো শুনি পঞ্চাশ হাজার টাকা রেখে গিয়েছেন। সেই টাকা সুদে খাটান। গয়না বিক্রি করে— ।

রাসু বললে—পঞ্চাশ হাজার থেকে একান্ন হাজার তো বেশী নবীন। সুদও পাব।

একটু চুপ ক'রে থেকে নবীন বললে—বেশ দেবেন তাই যদি ইচ্ছা হয় আপনার।

সন্ধ্যের সময় রাসু ঘরে খিল দিয়ে বের করে শ্বশুরের টাকা। মিটি মিটি আলোয় দেখা যায় না। সে হাত নেড়ে দেখে, টাকা নোট। সারা দেহে তার কম্পন বয়ে যায়।

শ্যামার বিয়েতে সিংহ দুটোকে আবার রঙ করা হয়েছিল। ঠিক তেমনি রঙ। রাসু সেই দুটোকেই দেখত ব'সে ব'সে।

শ্যামার বিয়েতে বড়মামা কিছু সম্পত্তি বিক্রী করেছিল। রাসুকেই অনুরোধ করেছিল সেটুকু কিনতে। কিন্তু রাসু কেনে নাই।

—না।

টাকা ধার চেয়েছিল বড়মামা।—বেশ সম্পত্তি না কিনিস, তোর বড়মামী বলছিল টাকা তুই সুদে খাটাতে চাস, তাই সুদেই ধার দে আমাকে।

—না মামা। আত্মীয়স্থলে সুদে কারবার···না মামা।

—পাকা দলিল ক'রে দেব আমি।

—না।

একসঙ্গেই ডান হাতে গোঁফে তা দেওয়ার এবং বাঁ হাতে টিকিতে পাক দেওয়ার অভ্যাস বড়মামার। গভীর চিন্তার সময় অভ্যাসটা বাড়ে। বড়মামা চলে গেলেন উপরে।

রাসু তার ছেলেকে কোলে ক'রে চুমায় তার মুখ ভরে দেয়। তাকে নিয়ে লুফতে থাকে। ছেলেটা আনন্দে খিল-খিল ক'রে হাসে। রাসুও হাসে।

উপর থেকে বড়মামীর চীৎকার শোনা যায়।

বড়মামার গলা শোনা গেল—চীৎকার করছ কেন? থাম না তুমি। এর জন্যে চীৎকার কেন? হাসতে হাসতে নেমে এল বড়মামা। বড়মামার হাসিতে যেন ক্ষুরের ধার। বড়মামীর কথা, ছোটমামীর হিসেব এ দুটো বড়মামার হাসির কাছে তুচ্ছ। হঠাৎ দাঁড়াল বড়মামা, বললে—কলকাতা বাজার করতে যাচ্ছে। তোর ছেলের একটা মাপের জামা দিস। ওর জামা চাই তো।

রাসু বললে—জামা ওর আছে বড়মামা—

হেসে বড়মামা বললে—তোর ছেলের জামার অভাব নাই সে আমি জানি। সে তো নাকের বদলে নরুন, ও শালার ঠাকুরদা'র সুদের টাকায় কেনা। সে কি আর কাজ কম্মের বাড়ীতে চলে রে! বড় বড় লোক আসবে। পাঠিয়ে দিস একটা জামা।

রাসুর বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে উঠল। স্তব্ধ হয়ে গেল সে।

ভারে ভারে বিয়ের আয়োজন এসে বাড়ী ঢুকছিল। মাটির বাসনে উঠানটা ভ'রে গেল। দাওয়ার উপর সারি সারি গুড়ের জালা, চিনির বস্তা, ময়দার বস্তা, ঘিয়ের টিন।

রাসুর মা গালে হাত দিয়ে বললে—হ্যাঁ, আয়োজন বটে বাবা!

রাসু ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ল। তার বুকের ভিতরটা এখনও কেমন করছে। অসহ্য বোধ হচ্ছে বাইরের গোলমাল। গোলমালের বিরাম নাই। সকাল থেকে আরম্ভ হয়েছে, ভর্তি দুপুর বেলা এখনও চলছে কলরব। রাসু ঘরের জানালা বন্ধ ক'রে দিলে। হঠাৎ উঠে আপনার বাক্স খুললে। শ্বশুরের টাকার পুঁটলী খুললে। নোট—টাকা—গিনি—। তার ছেলের টাকা। এই টাকা দিয়ে তার ছেলে বড় হয়ে বাড়ী করবে; সম্পত্তি কিনবে; গাড়ী করবে, ঘোড়া কিনবে, ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করবে; উৎসব করবে, সমারোহ করবে; এ টাকায় সে কি হাত দিতে পারে!

বাইরে শাঁখ বাজছে, উলু পড়ছে। আলোয় আলোময় হয়ে গেছে বাড়ীর উঠান। উঠানের মাথায় লালশালুর লতাপাতার নক্সা-কাটা চারিদিকে লাল-ঝালর-দেওয়া, ধপধপে সাদা চাঁদোয়া খাটানো হয়েছে। বাইরের দরজায় রসুনচৌকী বাজছে। গিস-গিস করছে লোক। হাঁকডাকে চারিদিক মুখর হয়ে উঠেছে, কুটুম্ব-সজ্জনে বাড়ী ভ'রে গেছে। এত বড় সমারোহ এ বাড়ীতেও যেন নতুন মনে হচ্ছে। রাসু অবাক হয়ে গিয়েছে। বড়মামী আজ সেকালের বড়মামী। রাসু একপাশে চুপ ক'রে বসে আছে। এর মধ্যে যেতে তার সাহস হচ্ছে না। আসরে বরযাত্রীরা বসেছে, বরাসনে বর ব'সে আছে, সাজ-পোশাকে সব ঝলমল করছে। বরের সামনে প্রকাণ্ড দুটো ফুলের তোড়া। গোলাপ-পাশে গোলাপ জল ছিটানো হচ্ছে।

হঠাৎ গোলমাল উঠল। দর-দালান থেকে বেরিয়ে এল বরকর্তা। পিছনে বড়মামা, ছোটমামা। বরকর্তা বলছিলেন—এ হয় না। ছেলের বিয়ে দিতে এসেছি আমি, মহাজনী করতে আসি নি। নগদ টাকা দেবার কথা, হ্যাণ্ডনোট নিয়ে কি করব আমি?

—কাল দেব।

—পণ বিবাহের আসরে দিতে হবে।

সমস্ত বাড়ীটা এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। এক একটা মুহূর্তে যেন একটা যুগ! তেমনি একটি মুহূর্তে সমস্ত স্তব্ধতা ভঙ্গ ক'রে রাসু ডাকলে—বড়মামা!

বড়মামা এসে দাঁড়াল।—মা রাসু! বড়মামার সে মূর্তি রাসু জীবনে ভুলতে পারবে না। সমস্ত অন্তর তার ভরে গেল। সে বললে—কত টাকা বড়মামা?

—আট শো! আট শো মা। বেশী নয়!

—আট শো? দাঁড়ান।

রাসু বের ক'রে আনলে আটশো টাকা। তার শ্বশুরের টাকা নয়, তার নিজের গহনা বিক্রী করা বারশো টাকার আট শো টাকা।

সে এক অদ্ভুত মুহূর্ত।

তারপর বিশ বৎসর।

বিশ বৎসর কেটে গেল। রাসুর দিন কাটল—ছেলে বড় হ'ল। শঙ্খপুরের-চাটুজ্জে বাড়ীর পলেস্তারা খসে গেছে। চিলে কোঠায় রাসু ঠাকরুণ নিত্য চুল শুকিয়েছে। তার পায়ের শব্দে সিঁড়ি কেঁপেছে। বড়মামী রাসুর তোষামোদ করছে। বড়মামা বেঁচে আছে। আটশো টাকার বদলে রাসুকে জমি দিয়েছে বড়মামা। আজ তার জমিদারী যায় যায়। রাসুর তোষামোদ করছে সে বহুদিন থেকে ঋণ নেবার জন্য। কিন্তু রাসু অনড়।

—ও সব ব'লনা বড়মামা। মধ্যে মধ্যে বলে—অবস্থা খারাপ হ'লে মানুষের মান-মর্যাদার জ্ঞান পর্য্যন্ত থাকে না।

বড় মামা হাসে। কিন্তু সে হাসির ধার পড়ে গেছে।

রাসুও হাসে। অদ্ভুত হাসি। লোকে বলে টাকার গরমে রাসুর মাথা খারাপ হয়েছে। কথাটা মিথ্যে নয়। রুঢ়-ভাষিণী রাসু সামান্য ছুতোয় কলহ ক'রে বলে—এ বাড়ীর ইঁট কিনব একখানা একখানা ক'রে।

হঠাৎ বিশ বৎসর পরে ছেলে বললে—বড়দাদুর সঙ্গে পাকা কথা হ'ল মা। লাট ভুবনপুরের অর্দ্ধেক অংশ—পনের হাজার টাকা দাম।

রাসু বললে—না।

—না, কি? এমন সম্পত্তি গেলে আর হবে না।

—না। টাকা আমি মরে গেলে নিবি।

ছেলে পায়ে জড়িয়ে ধরলে।

রাসু চীৎকার ক'রে উঠল—না—না—না।

শেষ পর্যন্ত গ্রামের দশজন ভদ্রলোক এল। তাদের সামনে ছেলে টেনে

ট্রাঙ্ক বের করলে : রাসু দাঁড়িয়ে রইল পাথরের মূর্তির মত। টাকার থলি বের হ'ল। বহুকালের জীর্ণ খেরুয়া কাপড়ের থলি। দশের সামনেই ছেলে টাকা নোট গিনি ঢাললে।

—আর টাকা কই? আর? এই কি পঞ্চাশ হাজার টাকা?

রাসু কি বলতে চেষ্টা করলে, তার ঠোঁট দুটো শুধু নড়ল, কোন শব্দ হ'ল না।

নোটে নগদে বাইশ শো কয়েক টাকা। আর তিনখানা গিনি।—আর টাকা কই? ছেলে মায়ের দুই কাঁধ ধ'রে ঝাঁকি দিলে নির্মম নিষ্ঠুর ভাবে।

—আমি তো জানি না।

—জানি না?

—গুণে তো কখনই দেখি নি।

—সে কি? রাসুর বড় মামা বললে—তবে যে তুইই বলতিস পঞ্চাশ হাজার।

—নবীন স্যাকরা বলেছিল পঞ্চাশ হাজার। রাসু থর-থর ক'রে বসে পড়ল।

* * * *

লজ্জায় ধিক্কারে ছেলে চলে গেছে—সে বাস করবে তার নিজের শ্বশুর-বাড়ীতে। টাকাগুলি নিয়ে গিয়েছে সে।

রাসু প্রতিটি জনকে বলেছে—হাতে ধ'রে বলেছে—ওই যা ছিল—আমি কখনও একটা পয়সা খরচ করি নি।

সকলে হেসেছে। বড়মামী হেসেছে—ছোটমামী হেসেছে। আশ্চর্য, রাসু তাতে আর ব্যথা পায় নাই। গ্রামের সকল লোককে বলেছে—আমি গরীব, আমি জানি না কিছু। আমি কিছু নাড়ি নি। এক পয়সা খরচ করি নি।

শঙ্খপুর থেকে সে রতনহাটি এসেছে। এই গরীবগুনোর গ্রামে গরীব সে বাকী জীবনটা এখানেই কাটিয়ে দেবে। ঘর-দোর ভেঙে পড়েছে, তাতে তার একটুও অস্বস্তি হয় নাই। গরীবেরা আরও কত বেশী খারাপ ঘরে থাকে।

বৈকুণ্ঠ বাগ্দী এসেছিল—রাসু বউ-ঠাকুরুণের সঙ্গে দেখা করতে। বাড়ী ঢুকতে সাহস পায় নাই, উঁকি মেরে বাইরের দরজার ওপাশ থেকে ডাকলে—বউ মা ঠাকরুণ!

—কে?

—আমি বৈকুণ্ঠ বাগ্দী।

—এস বাবা, ভেতরে এস।

—আজ্ঞে?

—ভেতরে এস বাবা। এস—এস। এইখানে বস।

বৈকুণ্ঠ শঙ্কিত হয়েই ভেতরে এল। রাসু বললে—বস বাবা বস। এইখানে বস।

বৈকুণ্ঠ বসল।

রাসু বললে—গরীব মা আমি—তোমাদের কাছে থাকব বলেই এলাম।

বৈকুণ্ঠ থতমত খেয়ে গেল।

রাসু বললে—শুধু বাইশ শো টাকা বাবা, সে কি টাকা? তাও খোকার—সে নিয়ে গেছে। মায়ের বাবা মাকে দিয়েছিল—বছরে এক শো টাকা আয়ের বিষয়। সে কি বিষয়? তাও তো দাদার। আমি গরীব। তুমিও যেমন গরীব, আমিও তেমনি গরীব।

শান্ত সন্ধ্যা নেমে আসছে। আকাশের আলোর আভা গোধূলি লগ্নে প্রতিবিম্ব ফেলেছে পৃথিবীর বুকে। বৈকুণ্ঠ অবাক হয়ে চেয়ে রইল সেই প্রতিবিম্ব-প্রতিফলিত রাসু ঠাকরুণের প্রশান্ত মুখের উপর।

তমসা

ব্রাঞ্চ লাইনের ছোট একটি ষ্টেশন।

লাল কাঁকর-বিছানো মাটির-সঙ্গে-সমতল প্লাট্ফর্ম, তাও একটা। প্লাটফর্মের কোলে পয়েন্টিং করা ছোট একখানি ঘরে ষ্টেশন-রুম, বাকীটা একটা টিনের শেড, সেই শেডের মধ্যেই ইঁট দিয়ে ঘেরা একখানা পার্শেল-রুম, তার পাশে এক টুকরো ঘরের দরজার মাথায় লেখা "জেনানা"।

ষ্টেশনের পিছন দিকে চা ও খাবারের ষ্টল। রেলের লাইসেন্স-প্রাপ্ত ভেণ্ডারের ষ্টল। ষ্টেশনের দেওয়ালের গায়ে টিনের চালা নামানো হয়েছে। তার পরেই গুডস শেডের সাইডিং লাইন। ওখান থেকেই চলে গিয়েছে সোজা উত্তর মুখে লাল মাটির গ্রাম্য রাস্তা। ইউনিয়ন বোর্ডের কল্যাণে দু'পাশে নালা কাটা হয়েছে, দড়ি ধ'রে বেশ সোজা লাইনে নয়, সাপের দাগের মত আঁকাবাঁকা করেই কাটা, তবু তাতেই খানিকটা সম্ভ্রান্ত চেহারা হয়েছে গ্রাম্য বাবুর মত। গ্রামের লোকে বলে ষ্টেশন-রোড, ইউনিয়ন বোর্ডের খাতাতেও তাই লেখা আছে। ষ্টেশন-সীমানা বা এরিয়া সামান্য। বুকিং অফিস, রেলওয়ে-লাইসেন্সপ্রাপ্ত ভেণ্ডারের চায়ের ষ্টল, মাল-গুদাম, দুটো মাত্র শান্টিং লাইন। বাস্—ষ্টেশন-এরিয়া শেষ। ষ্টেশন-সীমানার পরেই রাস্তার দু'পাশে খান-কয়েক ঘর, একখানায় পান বিড়ি-সিগারেট আর চা-খাবারের দোকান। দু'খানায় কয়লার ডিপোর গদী। একখানায় ষ্টেশন-ভেণ্ডারের বাসা। এদের পাশে এক বর্দ্ধিষ্ণু ভদ্রলোকের পাকা বাড়ী। বাকীটা ফাঁকা। বড় বড় বটগাছের ছায়া-ঢাকা তকতকে জায়গা। এইখানে গ্রামান্তরের গাড়ী এসে আড্ডা নেয়। এখান থেকে খানিকটা গিয়ে গ্রামের বসতি।

সকালে আপ ডাউন দু'টো ট্রেণ। এইখানেই ক্রশিং হয়। লোকে বলে 'মীট' হয়। ট্রেণ দুটো চলে গিয়েছে। ষ্টেশন-শেডের মধ্যে স্বল্প কয়েকটি লোক। অধিকাংশই স্থানীয়। যাত্রীর মধ্যে একটা খ্যামটা নাচের দল। দুটি তরুণী, একটি বুড়ী ঝি, পুরুষ তিনজনের একজন হারমোনিয়াম-বাজিয়ে, একজন বেহালাদার, একজন বাজায় ডুগি-তবলা। তাদের ট্রেণ বেলা দুটোয়। মেয়ে দুটির একটি কালো, দীর্ঘাঙ্গী, সে সেইখানে বসেই চুল বাঁধছে। অপরটি দেখতে সুন্দরী, সে একখানা বেঞ্চে ঘুমুচ্চে। হারমোনিয়ম বাজিয়েটি বেশ ফ্যাশন-দুরন্ত ছোকরা—সিগারেট মুখে সে প্লাটফর্মের এধার থেকে ওধার পায়চারী ক'রে ফিরছে।

একটা অন্ধ ছেলে বসে আপন মনেই ঢুলছিল। কুৎসিৎ চেহারা। চোখ দু'টো সাদা, সামনের মাড়িটা অসম্ভব রকমের উঁচু, চারটে দাঁত বেরিয়ে আছে, হাত-পাগুলো অপুষ্ট অশক্ত। পরণে একখানা মোটা সূতোর খাটো ময়লা কাপড়। মাথার চুলের পিছন দিকটা অত্যন্ত বিশ্রী ভাবে ছোট ক'রে কাটা। একটা ডুবকি হাতে নিয়ে আপন মনেই সে দুলছে, মধ্যে মধ্যে হাসছে, মধ্যে মধ্যে ঠোঁট নড়ছে, আপন মনেই কথা বলছে বুঝা যায়। মধ্যে মধ্যে চঞ্চল হয়ে উঠছে। কিছু শোনবার চেষ্টা করছে। কখনও জোরে নিশ্বাস নিয়ে কিছু শুঁকতে চাচ্ছে। জন কয়েক কুলি ষ্টেশনের ষ্টলের কাছে বসে আছে, গল্প-গুজোব করছে, মধ্যে মধ্যে ষ্টলের উনোন থেকে কাঠি জ্বালিয়ে বিড়ি ধরাচ্ছে। নিভে যাচ্ছে, আবার ধরাচ্ছে।

*　　*　　*　　*

প্লাটফর্মের প্রান্তে দাঁড়িয়ে হারমোনিয়ম-বাজিয়ে ছোকরা শিষ দিচ্ছিল। এখনও ঘণ্টা পাঁচেক এখানে কাটাতে হবে। নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন স্থান। দেখবার কিছু নাই। এমন কি তার সঙ্গে তরুণী দুটিকে দেখে ঈর্ষান্বিত হবার মত তরুণ ভদ্রগণের পর্য্যন্ত অভাব এখানে। চৈত্রের শেষ; সামনে

খোলা শস্যহীন মাঠে আকাশ থেকে মাটি পর্য্যন্ত পাতলা ধোঁয়ার একটা ছিলকে পড়েছে যেন। মধ্যে মধ্যে তাও যেন কাঁপছে।

ষ্টেশন-ঘরে কোকিল আছে। কোকিল ডাকছে ষ্টেশনের মধ্যে।

বিস্মিত হ'ল হারমোনিয়ম-বাজিয়ে। পাপিয়াও আছে না কি ?—'চোখ গেল' ডাক ক্রমেই চড়ছে।

কি বিপদ ! চিড়িয়াখানা না কি ? ভেড়া ডাকছে ! আরে দিনে শেয়াল ডাকে ! হারমোনিয়ম-বাজিয়ে অদম্য কৌতূহলের আকর্ষণে ফিরল ষ্টেশনের দিকে। ও হরি ! ও, অন্ধ ছোঁড়াটা ! ছোঁড়াটা কখন ডুবকি বাজিয়ে গান ধরেছে।

গলাখানি তো চমৎকার মিঠে ! ও বাবা ! শুধু গলাই মিঠে নয়, ছোকরা রসিকও খুব। গানখানা সত্যিই রসিকের উপযুক্ত।

"চোখে ছটা লাগিল,
তোমার আয়না-বসা চুড়িতে।
মরি, মরি বলিহারি—চোখে যে আর
সইতে নারি।
ঝিকিমিকি ঝিলিক নাচে।
হাতের ঘুরি-ফিরিতে।"

বেশ জমে উঠেছে এরই মধ্যে। ছোকরা উপু হয়ে ব'সে ডুবকি বাজিয়ে গান গেয়ে চলেছে, দস্তুর মুখে একমুখ হাসি, তালে তালে দুলছে। কুলীর দল তার দিকে ফিরে বসেছে। হারমোনিয়ম-বাজিয়ের সঙ্গিনীদের কেশ-প্রসাধনরতা কালো মেয়েটির বেণী-রচনারত হাত দু'খানি থেমে গিয়েছে, যে ঘুমুচ্ছিল সে ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে, তার সদ্য ঘুমভাঙা বড় বড় চোখ দু'টিতে স্মিত কৌতুকোজ্জ্বল দৃষ্টি। বুড়ী ঝি-টা দোক্তা সহযোগে পান চিবুচ্ছিল বেশ আরাম ক'রে, তার পান চিবুনো বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

"রিণিঠিণি রিণিঠিণি, চুড়ি আবার
তোলে ধ্বনি—

আমার প্রাণের ব্যায়্লা (বেহালা),
বাজে তোমার চুড়ির ছড়িতে !"

গানের গতি দ্রুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ছোঁড়াটার দোলার মাত্রাও দ্রুততর হচ্ছে। উল্টে প'ড়ে না যায়! ওপাশে বেঞ্চের উপর সদ্য-ঘুম-ভাঙ্গা মেয়েটি উঠে বসল। চুল বাঁধছিল কালো মেয়েটি, সে মুচকে হেসে বললে —মরণ।

ছোকরার তখন মাতন লেগেছে।—

"হায়—হায়, আমি যদি হতেম চুড়ি
কাঞ্চন নয়, কাচ-বেলোয়ারী
থাকতেম তোমার হাতটি বেড়ি—
জেবন সফল করিতে।
হায় হায়—থাকত না খেদ মরিতে।"

তেহাই দিয়েই সে গান শেষ করলে।

শ্রোতার দল উচ্ছ্বসিত কলরবে বাহবা দিয়ে উঠল। প্রশংসায় পরিতৃপ্ত অন্ধ দস্তুরের মুখ হাসিতে ভরে গেল। একজন শ্রোতা একটা জ্বলন্ত বিড়ি ওর হাতে সন্তর্পণে ধরিয়ে বললে—নে, খা।

—বিড়ি ?

—হ্যাঁ। খা।

হেসে অন্ধ বললে—কে সিগারেট খাচ্ছে। একটা ত্থান না কেনে গা!

দোকানী বলে উঠল—বেটা আমার বালকদাসী। "আমার নাম বালকদাসী, ভালমন্দ খেতে ভালবাসি!" সিগারেট খাবে! একটা সিগারেটের দাম কত জানিস্ ?

—আমার গানের বুঝি দাম নাই ?

—নে—নে খা। এই নে, এবার হারমোনিয়ম-বাজিয়ে একটা সিগারেট বা'র ক'রে দিলে তাকে।

সিগারেটটি নিয়ে সে সবিনয়ে বললে—পেণাম বাবুমশায় ! ঘোড়া দিলেন, চাবুক গ্যান। ‘দেশলাই’ জেলে গ্যান !

দেশলাই জেলে দিলে হারমোনিয়ম-বাজিয়ে। ওর সাদা ছাউনীপড়া চোখে আলোক শিখার প্রতিবিম্ব পড়ে না। উত্তাপ অনুভব করে সে।

সিগারেট টানে প্রাণপণে—সে টানের শক্তি-প্রয়োগে ওর মাথা ঘাড় থরথর ক’রে কাঁপে। দম ফুরিয়ে এলে তবে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে ছোঁড়াটা ধূমরুদ্ধ কণ্ঠে বলে -আঃ !

সকলে হাসে তার ভঙ্গী দেখে। হারমোনিয়ম-বাজিয়ে বাবুটি বললে—তুই তো বেশ গান গাইতে পারিস্ রে ! এ্যা !

—হ্যাঁ—ভাল ! বুঝলেন বাবুমশাই—সবাই বলে ভাল। তা’—। একটু চুপ ক’রে থেকে একটু হেসে বললে—খুব ভাল ক’রে গাইলে—মানে পান-মন সমপ্পন ক’রে গাইলে মোহিত ক’রে দিতে পারি। বুঝলেন !

এবার তরুণী দু’টি খিল-খিল ক’রে হেসে উঠল। সে হাসির শব্দে চমকে উঠল অন্ধ। হাতের সিগারেটটা প’ড়ে গেল মাটিতে। মাটির উপর আঙ্গুলের প্রান্ত দিয়ে অনুভব ক’রে সে সিগারেটটা খুঁজতে খুঁজতে বললে—হাসছে ? কে ? কারা ? তারপর মৃদুস্বরে ডাকলে—মলীন্দ।

‘মলীন্দ’ ওই কুলীদের একজন, সে বললে—কি ?

—শোন, বলি। সিগারেটটা হাতের ইসারায় ঠিক গোড়ার দিক ধ’রে তুলে নিলে।

—কি ?

—স’রে আয় কানে কানে বলব।

—কি ? বল ?

—মেয়েছেলেতে হাসছে। ভদ্দনোক লয় ?

—হ্যাঁ। বদ্দমানের।

—হুঁ। ঠিক বুঝতে পেরেছি আমি।

—কি ক'রে বুঝলি? অবিশ্বাসের হাসি হাসলে 'মণীন্দ'।

—বুঝলাম গলার রজ্ (আওয়াজ) থেকে?

—কিন্তু ভদ্রলোক জানলি কি ক'রে? 'মণীন্দ' প্রশ্ন করলে।

হেসে বললে অন্ধ—চুড়ির শব্দতে আর মিষ্টি সুবাস থেকে। অনেকক্ষণ থেকেই ও দুটো পাচ্ছিলাম, মনে মনে সন্দ লাগছিল। ছোটলোক হ'লে গায়ে ঘাম-গন্ধ ওঠে। কাচের চুড়িতে এমন মিঠে শব্দ ওঠে না। সোনার চুড়ি আছে হাতে, নয়?

—হ্যাঁ।

নীরবে সিগারেট টানতে টানতে অন্ধ বার বার জোরে নিশ্বাস টানে ওই মিষ্ট গন্ধ নেবার জন্য। হঠাৎ সে বললে—তা'—। ঠাকরুণরা হাসছেন—আপনাদিগে বলছি—

কালো মেয়েটি মুখরা—চপলা। খোঁপায় কাঁটা আঁটছিল সে। ঘাড়টি ঈষৎ ফিরিয়ে অন্ধের দিকে চেয়ে বললে—আমাদের বলছ?

—হ্যাঁ, আপনারা হাসলেন কেনে?

কালো মেয়েটিই এবার মুখ টিপে হেসে বললে—সে আমরা নই, অন্য লোকে।

—অন্য লোকে? অন্ধ ঘাড় নেড়ে মৃদু হেসে বলে—উঁহু।

—উঁহু কেন? অন্য লোকেই তো হাসলে।

ছোকরা এবার একটু বেশী হেসে বললে—শিঙেতে বাঁশী বাজে না ঠাকরুণ, ক্যানেস্তারায় তবলার বোল ওঠে না।

—ও মা গো! মেয়েটি বিস্ময়ে কৌতুকে চোখ বিস্ফারিত ক'রে সঙ্গিনীর সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করলে।

সুন্দরী তরুণীটির মুখেও মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠেছিল—কিন্তু সে হাসির চেহারা যেন ভিন্ন রকমের। সে এবার বললে—আমরা হেসেছি বলে তুমি রাগ করছ নাকি?

—রাগ? অন্ধ হেসে বললে—ওরে বাপ রে, আপনকাদের ওপর কি রাগ করতে পারি মশায়? তবে হাসলেন কেনে, তাই শুধালাম, বলি- অন্যায় কিছু বললাম না কি?

—হারামজাদা! দোকানী বলে উঠল, ওরে শূয়ার, হাসছেন তোমার 'মোহিত' শুনে।

—কেনে—মোহিত ক'রে দিতে পারি না আমি?

খুব হয়েছে। থামো!

—কেনে?

—কাকে কি বলছিস্ জানিস্?

অন্ধ এবার সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

ওঁরা হলেন কলকাতার গাইয়ে—কলের গান শোন নাই হারামজাদা। সেই রকম গাইয়ে—বড় বড় বাইজী! বেটা পঙ্কীরাজ ওঁদিকে মোহিত ক'রে দেবেন।

অপরাধীর মত সে এবার বল্লে—তা হ'লে তো অপরাধ হয়ে যেয়েছে।

হ্যাঁ, তা হয়েছে।

কালো মেয়েটি চুল বাঁধা শেষ ক'রে গামছা কাঁধে ফেলে—স্যুটকেশ খুলে সাবান বা'র ক'রে নিয়ে বললে—কাছেই পুকুর-ঘাট, নেয়ে আসি আমি।

অন্ধ হাতের সিগারেটটা ফেলে দিলে ছুড়ে। উপরের দিকে মুখ ক'রে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিঃশব্দে হাঁ ক'রে হাসতে লাগল—নাকের ডগাটা তার ফুলে ফুলে উঠছিল। অত্যন্ত হাস্যকর এবং কুৎসিত সে মুখভঙ্গি।

দোকানী বললে—দেখ দেখ হারামজাদার মুখ দেখ। এই হারামজাদা পঙ্কে!

অন্ধের নাম 'পঙ্কী'—পঙ্কে আকর্ণ-বিস্তার নিঃশব্দ হাসি হেসে বললে—ভারী সোন্দর বাস উঠছে সিংজী। পরাণ একেবারে মোহিত ক'রে দিলে।

সুন্দরী মেয়েটি বললে—তোমার সেই মোহিত করা গান যদি গাও তবে তোমাকে ওই সাবানখানা দিয়ে যাব।

মাথা চুলকে পঙ্কী বললে—দিয়ে যাবেন? গান গাইলে?

—হ্যাঁ।

—কিন্তুক। একটু চুপ ক'রে থেকে পঙ্কী বললে—আমার আস্পদ্ধা হয়ে যেয়েছে আজ্ঞে; গান কি আপনকাদের ছামনে গাইতে পারি আমি?

—কেন? তুমি তো খুব ভাল গান গাইতে পার। ভারী সুন্দর গলা তোমার!

—ভাল লেগেছে আপনকার? পঙ্কীর অভ্যস্ত-নিঃশব্দ হাসিতে মুখ ভ'রে গেল।

কালো মেয়েটি বললে হারমোনিয়ম-বাজিয়েকে—এস আমার সঙ্গে। ঘাটে একটু দাঁড়াবে।

পঙ্কী বললে—একটা কথা বলব ঠাকরুণ?

স্নিগ্ধ হাসি হেসে সুন্দরী মেয়েটি বললে—বল।

—রাগ করবেন না তো?

—না না! বল।

পঙ্কী কিন্তু চুপ ক'রে রইল। তারপর হঠাৎ বললে—নেতাই, মলিন্দ! চলে গেলি না কি? নেতাই?

—কেনে, নেতাইকে কেনে? দোকানের দরজা বন্ধ করতে করতে দোকানী বললে—জল খাবে না সব? বাড়ী যাবে না?

হেসে পঙ্কী বললে—আপনিও দোকানে তালা দিছেন লাগছে!

—হুঁ দিলাম। জল খাবি তো আয়—আমি যাচ্ছি বাড়ী।

—উঁহু। ক্ষিদে নাই আজ।

সাড়ে দশটা পার হয়ে গিয়েছে। চৈত্র মাসে এবার এরই মধ্যে চারিদিক

ধূলিধূসর এবং উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। ষ্টেশনে টিনের শেডে উত্তাপের প্রাখর্যে মধ্যে মধ্যে কটাং কটাং শব্দ উঠছে। লাইনের জোড়ের মুখেও শব্দ উঠছে।

সুন্দরী তরুণীটি এক দৃষ্টিতে অন্ধ পঙ্কীর দিকে চেয়ে রয়েছে। পঙ্কী স্তব্ধ হয়ে বসে আছে। কখনও কখনও মুখ তুলছে—কিন্তু পরমুহূর্তেই ঘাড় নামাচ্ছে।

মেয়েটি বললে—কই বললে না তো?

—আজ্ঞে?

—কি বলবে বলছিলে?

—বলছিলাম—! পঙ্কী লজ্জিত অপরাধীর মত হেসে ঘাড় নামালে।

—বল।—ব'লে মেয়েটি প্রতীক্ষা ক'রে থাকে। প্রতীক্ষার মধ্যেই সে অন্যমনস্ক হয়ে ধূলিধূসর দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকে এক দৃষ্টিতে। পঙ্কী ঘাড় তোলে মধ্যে মধ্যে, আবার ঘাড় নামায় এই অবসরের মধ্যে। হঠাৎ এবার সে বলে ফেললে—বলছিলাম কি—?

ঠিক এই সময়েই মাথার উপর টিনের শেডের উপর শব্দ উঠল অত্যন্ত জোরে। মেয়েটি চমকে উঠল—কি রে বাবা?

—উ আজ্ঞে—। বিজ্ঞের মত হেসে পঙ্কী বললে—রোদের তাতে টিনে শব্দ উঠছে।

—তাই না কি? রোদের তাপে টিনে শব্দ ওঠে?

—হ্যাঁ। এ এখন সেই সন্ধে বেলা পর্যন্ত উঠবে। এই দেখুন—এ শব্দ কিন্তু তাতের নয়! কাক বসল চালে।

মেয়েটি বেরিয়ে গিয়ে দাঁড়ালো প্লাটফর্মের উপর। কৌতূহল হ'ল তার। সত্যিই কাক বসেছে। সে বিস্মিত হয়ে ফিরে এসে দাঁড়াল—পঙ্কীর কাছে। পঙ্কী চঞ্চল হয়ে উঠল। কয়েকবার স্ফীত হয়ে উঠল নাসারন্ধ্র, মৃদুস্বরে সবিনয়ে বললে—বলছিলাম কি আজ্ঞে—।

মেয়েটি দুটি আঙুল ওর চোখের সামনে নাড়ছিল।

পঙ্কী বললে—বলব মশায় নির্ভয়ে ?

মেয়েটি আঙুল সরিয়ে নিলে পঙ্কীর নিস্পলক চোখের সামনে থেকে। বললে—বল। বার বারই ত বলতে বলছি !

—আপুনি একটি গান যদি গাইতেন। কথা অর্ধসমাপ্ত রেখে—নিঃশব্দে হাসিতে বিস্ফারিত মুখে সে মাথা চুলকাতে লাগল।

মেয়েটি হাসলে।—গান শুনবে ?

মাটিতে হাত বুলিয়ে অনুভব ক'রে পঙ্খী মেয়েটির পায়ের আঙুলের প্রান্ত স্পর্শ ক'রে বললে—আপনাদের চরণ কোথা পাব বলেন ? গানই বা শুনব কি ক'রে ? তবে—। একটু নীরব থেকে উপরের দিকে তার দৃষ্টিহীন মুখ তুলে বললে—সাধ তো হয়। মনিষ্যি তো বটে। আর গান শুনতে ভালবাসি আমি।

কি মনে হ'ল মেয়েটির, করুণা হয় তো—হয় তো খেয়াল—বললে—আচ্ছা। বলেই—আবার চিন্তিত মুখে বললে—হারমোনিয়ামটা যে দেখি অনেক জিনিষ চাপা পড়েছে।

—হারমণি ?

—হ্যাঁ ?

—হারমণি থাক। আপুনি এমনি গান। আস্তে আস্তে গান। রোদ বেজায় চড়েছে। শুধু গলায় আস্তে গান, ভারী ভাল লাগবে।

কল্পনাটি বড় ভাল লাগল মেয়েটির। ঠিক বলেছে অন্ধ। সে গান ধরলে মৃদুস্বরে।

"কালা তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি।
কভু পথের পরে, কভু নদীর পারে
চেয়ে চেয়ে ক্ষয়ে গেল আমার
কাজল পরা জোড়া-আঁখি।"

পঙ্কীর সর্বাঙ্গ যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। মস্তিষ্কের মধ্যে শিরায় উপ-

শিরায় ওই গানের ধ্বনি-ঝঙ্কার বীনের বহুতন্ত্রী ঝঙ্কারের মত ধ্বনি তুলে সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে তার।

গান শেষ হয়ে গেল। অন্ধকে গান শুনিয়ে মেয়েটির ভারী তৃপ্তি হ'ল। ঈষৎ হেসে সে প্রশ্ন করলে—কেমন? ভাল লাগল?

—আজ্ঞে? চকিত হয়ে উঠল পঙ্খী। তার অসাড় নিস্পন্দ শরীরে মুহূর্তে চেতনার প্রবাহ বয়ে গেল।

—ভাল লাগল?

পঙ্খী বললে—জেবন ধন্য হ'ল আমার ঠাকরুণ।

মেয়েটি এবার হেসে ফেললে।

—হাসছেন?—তা'—। একটু চুপ ক'রে থেকে পঙ্খী বললে—তা' এমন গান জেবনে কোথা শুনতাম বলেন! পঙ্খীর কথাগুলির মধ্যে একটি বেদনার সুর ছিল—তার স্পর্শে মেয়েটি আর হাসতে পারলে না। চুপ ক'রে গেল। কোন কথাও খুঁজে পেলে না।

পঙ্খী বললে—একটি পেণাম করব আপনকাকে।

—প্রণাম? কেন?

—ভারী সাধ হচ্ছে।

লোভ হ'ল মেয়েটির। মুগ্ধদৃষ্টি, অজস্র প্রশংসা, প্রেম-গুঞ্জন, অনেক পেয়েছে সে এবং পায়। কিন্তু প্রণাম? মনে পড়ল না তার। নিজেদের সমাজের ছোটরা অবশ্য প্রণাম করে। কিন্তু এ প্রণামের দাম অনেক বেশী বলে মনে হ'ল তার। সে প্রতিবাদ করলে না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

পঙ্খী হাত বুলালে তার পায়ের উপর, তারপর মেয়েটির দু'খানি পায়ের উপর নিজের মুখখানি রাখলে।

মেয়েটির ভারি ভাল লাগল।

মেয়েটি পায়ে উষ্ণ নিশ্বাস অনুভব করলে, পঙ্খীর বিকৃত চোখ থেকে জল ঝ'রে তার পায়ে লাগছে। তবু সে পা সরিয়ে নিলে না। ধূলিধূসর

দিগন্তের দিকে অর্থহীন স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে সে চুপ ক'রেই দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ প্রশ্ন করলে—তোমার কে কে আছে বাড়ীতে? মা—মা আছে? বাপ আছে?—শুনছ?······ওঠ! ওঠ? অনেক প্রণাম করা হয়েছে। ওঠ। ওঠ।

—আরে এই বেটা! এই! ও হচ্ছে কি? এই! হারমোনিয়ম-বাজিয়ে এবং সেই কালো মেয়েটি স্নান সেরে ফিরে এসেছে। হারমোনিয়ম-বাজিয়ে ধমক দিলে পঙ্কীকে।

কালো মেয়েটি বললে—মরণ!

সুন্দরী তরুণীটি মৃদুস্বরে আবার বললে—ওঠ! ওঠ!

এবার পঙ্কী উঠল। তার দিকে চেয়ে কালো মেয়েটি এবং হারমোনিয়ম বাজিয়ে একসঙ্গে হেসে উঠল। পঙ্কীর চোখের জলে ভিজে মেয়েটির পায়ের আলতা অন্ধের মুখময় লেগেছে। গালে, নাকে, কপালে, ঠোঁটে—মুখময় লাল রঙ।

মেয়েটি বললে—মুখটা মোছ। গোটা মুখে তোমার লাল রঙ লেগেছে।

—লাল রঙ?

—হ্যাঁ, আলতা লেগেছে।

—আলতা?

—হ্যাঁ—ঠোঁটে, মুখে, গালে, নাকে—মুছে ফেল।

—থাকুক আজ্ঞে।

কালো মেয়েটি বললে সঙ্গিনীকে—নে নে ওর সঙ্গে আর ন্যাকামী করতে হবে না। ওদিকে দেখে এলাম ভাত হয়েছে। নেয়ে নিবি তো নেয়ে আয়। সুন্দর জল পুকুরের।

—কত দূর?

পঙ্কী উঠে দাঁড়াল?—এই কাছেই আজ্ঞে। কাছেই। চলেন আমি নিয়ে যাচ্ছি। আসুন।

—তুমি ?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—কাণাদের পথঘাট মুখস্থ। ঠিক নিয়ে যাবে। যা না। কালো মেয়েটি একটু হেসে বললে—নিশ্চিন্দি চান করবি—ও বসে থাকবে ঘাটে।

সত্য কথা। দিব্য পথে পথে চলে পক্ষী। মধ্যে মধ্যে পা বুলিয়ে অনুভব ক'রে নেয়। ষ্টেশন-রাস্তার ধারে প্রথম বটগাছটার তলায় ছায়ায় এসে বলে—এই বটতলা এয়েচে। আসেন এই বাঁ ধারে।

একটু অগ্রসর হ'তেই পুকুর দেখা যায়। কালো কাজলের জল।

মেয়েটি বললে—তোমার নাম কি ?

—আমার নাম ? আমার নাম 'পক্ষে'। 'পক্ষী' আর কি।

—পক্ষী ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ছেলেবেলায় পাখীর মতন চিঁ চিঁ ক'রে চেঁচাতাম কিনা! কাণা বলে মা হেনস্তা করত। ভুঁয়ে পড়ে চেঁচাতাম।

—মা বাবা আছে তোমার ?

—হ্যাঁ। যাই আমি বাড়ী মাঝে মাঝে। বাবা আমার নোক ভাল। বাবার নাম—এখানে—। হঠাৎ কথায় ছেদ ফেলে দেয় নিজেই—উপরের দিকে মুখ তুলে বলে—হ—হ। মরালের বড় ঝাঁকটা এসেছে লাগছে।

একটা প্রকাণ্ড ঝাঁক—মেটে রঙের বুনো হাঁস সত্যই মাথার উপর পাক দিচ্ছিল, তাদের পাখার ডাক ধরেছে আকাশে।

মেয়েটিও আকাশের দিকে চেয়ে দেখলে।

পক্ষী বললে—তার অর্ধসমাপ্ত কথা শেষ করলে সে।—বাবার নাম এখানে—সবাই জানে। কৃত্তিবাস বাগ্দীর নাম—।

* * * *

বাবার নাম কৃত্তিবাস। অন্ধ অপরিণত অপুষ্টাঙ্গ ছেলের চীৎকার শুনেই তার নামকরণ করেছিল—পক্ষী। ভাল মিষ্ট গৌরবজনক নাম রাখার প্রয়োজনই অনুভব করেনি কোন দিন।

পঞ্চী বললে। ঘাটের ধারে বসেছিল সে, মেয়েটি ঠাণ্ডা জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে তার কথা শুনছিল। পঞ্চী বললে—আমার এক দিদি আছে। দিদি আমাকে ভালবাসত, কোলে নিত। তা'—এই আপনাকার মতন বয়েস হবে তার।

আমার মত ? ঈষৎ হেসে মেয়েটি বললে—আমার বয়েস কি ক'রে বুঝলে তুমি ?

সলজ্জ হাসি হেসে মাথা চুলকে পঞ্চী বললে—তা' আপুনি আমার চেয়ে এই খানিক বড় হবেন। তার বেশী নন। একটু চুপ ক'রে থেকে বললে—গলার রজ (আওয়াজ) শুনে বুঝতে পারি কি না খানিক-আধেক। আপনার গলা এখনও বাঁশের বাঁশীর মত। খাদ মেশে নাই। তা ছাড়া—

পঞ্চী থেমে গেল। সে বলতে পারলে না কথাটা। পায়ের উপর মুখ রেখেছিল সে, কোমল মসৃণ স্পর্শ এখনও সে যেন অনুভব করছে।

কথাটা পাল্টে বললে—এখান থেকে বাড়ী আমার ক্রোশ চারেক হবে। বছর খানেক আগে মা একদিন খুব মেরেছিল। তা' দিদি বললে—পঞ্চে, তুই তো গান গাইতে পারিস্, তা ভাল বাজারে জায়গায় যা না কেনে। গান গাইবি, ভিখ করবি। কথাটা মনে লাগল আমার। দিদিই একদিন আমার হাত ধ'রে এখানে রেখে গেল। সেই অবুধি—। নিঃশব্দে হেসে সে চুপ ক'রে গেল।

হঠাৎ এক সময় বলে উঠল—আপনকার গানের ওইটুকুন ভারী সোন্দর। সেই কি—কালা তোমার যখন বাজে বাঁশী। বলতে বলতে সে সুরেই গাইতে আরম্ভ করলে।

ঘর-কন্না সব ভুলে যাই ছুটে যে আসি।
আমার গা-ঘষা হয় না, আমার কেশ-বাঁধা হয় না,
আরও হয় না কত কি !

মেয়েটি সাবান মাখছিল—বিস্ময়ে তার হাত থেকে পড়ে গেল। অবিকল সুরে নির্ভুল গানখানি গাইছে পঞ্চী।

--আঃ—নাইতে আর লাগে কতক্ষণ ? ওদিকে যে ট্রেণের সময় হয়ে এল। হারমোনিয়ম-বাজিয়ে ডাকলে ঠিক এই সময়ে। ঘাট থেকে ত'কে দেখা যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে ডাকতে এসেছে।

সত্যই ষ্টেশনে টিকিটের ঘণ্টা বেজে উঠল।

* * * *

ট্রেণ চলে গেল। খ্যামটার দলটিও চলে গেল। দোকানী সিং ট্রেণের প্যাসেঞ্জারদের চা-সরবৎ, জলখাবার বিক্রী শেষ ক'রে ডাকলে--পঞ্চে! পঞ্চে!

পঞ্চের সাড়া পাওয়া গেল না। গেল কোথায় ?

দোকানী ওকে সত্যই ভালবাসে। দোকানীর স্ত্রীও ভালবাসে। যেদিন পঞ্চীর কোথাও অন্ন না জোটে সেদিন দোকানী ডেকে খেতে দেয়। দু'টোর ট্রেণ গেলেই দোকানী একবার পঞ্চীর খোঁজ করে। পঞ্চীর সাড়া পাওয়া গেল না। বোধ হয় গ্রামের মধ্যে গোবিন্দ-বাড়ীতে গিয়েছে প্রসাদের জন্য, কিম্বা গিয়েছে চণ্ডীতলায়। চণ্ডীতলায় পঞ্চপর্বে বলি হয়—পঞ্চে হিসেব রাখে কবে অমাবস্যা, কবে চতুর্দশী, কবে অষ্টমী—কবে সংক্রান্তি, সেদিন সে চণ্ডীতলায় যাবেই। নিশ্চয় দু'জায়গার এক জায়গায় গিয়েছে সে। দোকানী আপনার দোকানের কাজে মন দিল। দু'টোর ট্রেণের পর আবার চারটেয় আসবে আর একখানা ট্রেণ।

চারটের ট্রেণ এল, চলে গেল। দোকানী এবার ব্যস্ত হয়ে উঠল—পঞ্চে এখনও ফিরল না কেন ? সে গেল কোথায় ? ট্রেণে খ্যামটার দলের সঙ্গে চলে গেল না কি ?

সত্যই তাই। পঞ্চী চুপি চুপি ট্রেণে চেপে পড়েছিল। বেঞ্চের তলায় ঢুকে শুয়েছিল। জংশন ষ্টেশনে নেমে কিন্তু ভিড়ের মধ্যে তাদের হারিয়ে ফেললে।

ব্রাঞ্চ লাইনের গার্ড ড্রাইভার সবাই পঞ্চীকে চেনে। তারা বললে—তুই এখানে ?

আকর্ণ-বিস্তার হাসি হেসে সে বললে—হ্যাঁ। এখানেই এলাম। বলি একবার ঘুরে ফিরে আসি। একটু চুপ ক'রে থেকে হাসিটা আরও একটু বিস্তৃত ক'রে বললে—নতুন জায়গা দেখতে শুনতে তো সাধ হয়!

হেসে দত্তবাবু গার্ড বললে—বেশ, দেখা তো হ'ল—এইবার চল।

ফিরে যেতে কিন্তু পঞ্চীর কেমন লজ্জা হ'ল। সে বললে—না! থাকব এইখানে দু'দিন দশ দিন।

—থাকবি?

—হ্যাঁ। এখানকার বাজারটা কি রকম দেখি একবার। উত্তর শুনে হেসে দত্ত গার্ড চলে গেল। কয়েক মুহূর্ত পরেই পঞ্চীর একটা কথা মনে হ'ল। —গাড বাবু! গাড বাবু! গার্ড বাবুকে সে বলতে চাইছিল—এখানকার ষ্টেশন মাষ্টার—জমাদার—ষ্টলওয়ালা—এদের কাছে তাব জন্যে একটু বলে দেবার জন্য।

গার্ডবাবুর সাড়া পাওয়া গেল না। গার্ড তখন ষ্টেশনের ভিতরে।

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পঞ্চী চলতে আরম্ভ করলে। ঠিক এসে উঠল ষ্টলের সামনে।

—কি ভাজছেন দোকানীমশায়? সিঙাড়া কচুরী?

দোকানী তার দিকে চেয়ে বললে—সরে বস!

সরেই একটু বসল পঞ্চী। তারপর সে তার ডুবকীতে আঙুলের ঘা দিয়ে আরম্ভ করলে—ও—কালা!

দত্ত গার্ডকে প্রয়োজন হ'ল না। নিজেকে নিজেই চিনিয়ে নিলে পঞ্চী। দোকানী, ষ্টেশন-মাষ্টার, জমাদার, জমির-উপর-পাতা লাইন, সিগন্যালের তার, বাজার, পথ, ঘাট, সব তার পরিচিত হয়ে গেল। কালীমায়ের স্থান, গৌরাঙ্গের আখড়ার পথও তার মুখস্থ! জংশনের সারি সারি রেললাইন প্রায় অনায়াসেই পার হয়ে যায় সে। প্রথমে এসে একটুখানি দাঁড়ায়, লোকের সাড়া পেলে জিজ্ঞাসা করে—কে বটেন গো?—লাইনে গাড়ী রয়েছে না কি?

লোক না থাকলে—কান পেতে শোনে ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যায় কি না। তারপর এগিয়ে এসে লাইনের উপর পা দেয়। স্পর্শ ক'রে বুঝে নেয়—চলন্ত ট্রেণের গতিবেগ তার মধ্যে প্রবাহিত হচ্ছে কি না। পক্ষী বলে—ভয় লাগলে শিরদাঁড়া যেমন যেমন শির-শির করে—তেমনি শিরশিরিনি বয় লাইনে। সন্দেহ হ'লে লাইন ছেড়ে সে ওভারব্রিজের দিকে যায়—এক পাশের রেলিং ধ'রে স্বচ্ছন্দে পার হয়ে যায় সে। সিঁড়ির সংখ্যা তার মুখস্থ।

ডুবকীর সঙ্গে এখন একটা হাঁড়ি শুদ্ধ রেখেছে। আঙুল দিয়ে বাজিয়ে অনেক পরীক্ষা ক'রে কিনেছে। হাঁড়ি বাজিয়ে গান করলে লোক জমে বেশী।

মধ্যে মধ্যে ষ্টেশন-ঘরের দরজায় গিয়ে বসে। বসবার সময়টি তার দুপুর বেলায়, একটা থেকে আড়াইটার মধ্যে। এ সময়টায় মাষ্টার বাবুরা ব'সে গল্প-গুজব করে। সে শোনে। গল্পের মধ্যে ছেদ পড়লেই বলে—মাষ্টার বাবু!

—কি রে ব্যাটা? এসেছ তো!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তা' কি বলছ?

—আজ্ঞে! মাথা চুলকায় পক্ষী।

—কি জিজ্ঞাস্য? বর্ধমান কত দূর? কত ভাড়া?

—আজ্ঞে না, বলছিলাম বলি—। হাসির ভঙ্গীতে দস্তুর পক্ষী আরও একটু দন্ত বিস্তার ক'রে বাবুদের কাছ থেকে উৎসাহ-বাক্য প্রত্যাশা করে। পায় সে উৎসাহ বাক্য।

—কি বলছিলে? বর্ধমান শহরটা কেমন? কত বড়?

—হ্যাঁ। আরও একটু বেশী দন্তবিস্তার করে সবিনয়ে!

—বর্ধমান যাবি? দেব একদিন চড়িয়ে গাড়ীতে?

পঞ্চী চুপ ক'রে থাকে। সম্মতি জানাতে শঙ্কিত হয়। গাড়ী-ঘোড়া, লোকজন, গলি-ঘুঁজি, প্রকাণ্ড বড় সহর—তার মধ্যে কোথায়—?

টেলিগ্রাফের যন্ত্রটা শব্দ ক'রে ওঠে ওদিকে টেলিগ্রাফের ঘণ্টা বাজে ঠিন—ঠিন। বাবুরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পঞ্চী উঠে' আসে। ভাবতে ভাবতে প্লাটফর্মের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়। কাছেই টেলিগ্রাফের পোষ্টে বাতাসের প্রবাহে শব্দ ওঠে, গায়ে-লাগানো মাইল-লেখা লোহার প্লেটটা অত্যন্ত দ্রুত শব্দ ক'রে কাঁপে। পঞ্চী ধীরে ধীরে টেলিগ্রাফ-পোষ্টে কান লাগিয়ে দাঁড়ায়। পোষ্টের গায়ে আঙুল বাজিয়ে বলে—টরে-টক্কা, টরে-টক্কা, টক্কা-টক্কা টরে। তারপর বলে—হ্যালো। হ্যালো। ঠাকরুণ, বর্দ্ধমানের ঠাকরুণ। আমি পঞ্চী। গান গাইছি আমি।

"ও তোর তরে কদমতলায় চেয়ে থাকি!"

* * * *

দিন যায়। এক বৎসর হয়ে গেল। পঞ্চী জংশনেই রয়েছে। টাকা-পয়সা কিছু জমেছে তার। দোকানীর কাছে রাখে তার কিছু অংশ। দোকানী জানে ঐ তার সব। কিন্তু পঞ্চী তার উপার্জ্জনকে ভাগ করে। কিছু নিজের কাছে রাখে। বাকীটা রাখে জেনানা ওয়েটিং রুম কাঠে-ঘেরা ছোট্ট চোর কুঠুরীর মত ঘরটার এক কোণে মাটিতে পুঁতে। জংশন হলেও ব্রাঞ্চ লাইনের প্লাটফর্মটা পাকা নয়। জেনানা ওয়েটিং রুমটার মেঝেও কাঁকরমাটির মেঝে। তার উপর রাখে তার বিছানাটা। বিছানা একখানা বস্তা। রাত্রে ওইখানে বস্তা বিছিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে প'ড়ে থাকে।

বর্দ্ধমানের বাতিকটা কমে গিয়েছে। "কালা তোর তরে—" গানখানা সে গায়, লোকে তারিফ করে, পঞ্চী সবিনয়ে হাসে, কিন্তু আর সেই চৈত্র-দুপুরে গেঁয়ো ষ্টেশন-প্লাটফর্মে নরম দু'খানি পায়ের উপর মুখ রেখে প্রণাম করার কথা মনে পড়ে না। সেই মিষ্টি প্রাণমাতানো গন্ধের কথাও মনে

পড়ে না, মনে পড়ে না ঠিক নয়, মনে পড়ে কিন্তু বুকের ভেতরটা তেমন 'আকুলি' ক'রে ওঠে না।

কত দিন পর। অনেক দিন। হঠাৎ সেদিন সমস্ত শরীরে তার শির শির ক'রে কি বয়ে গেল। লাইনের উপর ট্রেণ গেলে যেমন শব্দে স্পর্শে শিহরণ জাগে।

সেই গান। সেই গলা। আজ আর গান শুধু নয়—গানের সঙ্গে যন্ত্র বাজছে। ষ্টেশনের ঘরের সামনে ঠাকরুণ গান করছে। "কালা তোর তরে—।"

পঞ্চী প্রায় ছুটে এসে দাঁড়াল। বেশ বুঝতে পারলে ঠাকরুণের সঙ্গে অনেক লোক রয়েছে। ছোট ছেলেও রয়েছে।

গান শেষ হতেই সে হাত জোড় ক'রে বললে—ঠাকরুণ!

—কে রে তুই?

—আজ্ঞে যে ঠাকরুণ গান গাইলেন তাকেই বলছি আমি।

সঙ্গে সঙ্গে হাসির হুল্লোড় প'ড়ে গেল। একজন বললে—মরণ!

আবার গান আরম্ভ হ'ল। "চোখে ছটা লাগিল—" পঞ্চীর বুক একেবারে দুলে উঠল। তার সেই গান। নিতাই কবিয়ালের কাছে সে শিখেছিল—ঠাকরুণ শিখেছিল তার কাছে।

গান শেষ হ'ল!

—আমাকে চিনতে পারলেন না ঠাকরুণ। আমি পঞ্চী—।

—এই ব্যাটা এই। ভাগ!

ভাগিয়ে দিলেও সে এবার সঙ্গ ছাড়বে না। সে সজাগ হয়ে বসে থাকে। ট্রেণের ঘণ্টা পড়ল। যাত্রীর দলটি আসর গুটিয়ে নিলে। একজন বললে—গ্রমোফোনটা ভাল ক'রে বন্ধ করিস্। রেকর্ডগুলো বাক্সের মাধ্য পুরে নে।

গাড়ী এল। চলে গেল—ষ্টেশন ষ্টাফ ষ্টলওয়ালা বিস্মিত হ'ল। পঞ্চী নাই।

*　　*　　*　　*

আরও অনেক কাল পর। অনেকগুলি বৎসর চলে গিয়েছে। পঙ্খীর চুলে সাদা ছোপ পড়েছে। দন্তুর মুখের দাঁত পড়েছে কয়েকটা। কানে শোনার শক্তি কমে' এসেছে। লাইনে পা' দিয়ে দূরে ট্রেণ আসছে কি না আর ধর্‌তে পারে না।

পঙ্খী এক তীর্থক্ষেত্রে পথের ধারে বসে ভিক্ষা করে। গানও আর তেমন গায় না। বলে—অন্ধজনে দয়া কর বাবা! অন্ধকে একটি পয়সা দাও মা। মা লক্ষ্মী—জননী!

মা-জননীরা যখন যায় তখন পঙ্খী বেশী আকুলতা প্রকাশ করে। জুতোর শব্দ থাকে না—অথচ খস-খস শব্দ ওঠে গরদের কাপড়ের, পূজোর ফুলের গন্ধ ওঠে, পঙ্খী বুঝতে পারে মা-লক্ষ্মীরা আসছেন।

যেদিন ভিক্ষে কম হয় সেদিন গান করে।

সেদিন সে গান গাইছিল। "চোখে ছটা লাগিল—"গাইতে আজকাল ভাল লাগে না। ভক্তিরসের গানই বেশী গায়। 'কালা তোর তরে' গানখানা মাঝে মাঝে গায়। সেদিন গাইছিল সে ওই গানখানাই।

গান শেষ হতেই একজন হেসে বললে—খুব গেয়েছিলে গানখানা রেকর্ডে। ঘাটে মাঠে হাটে ছড়িয়ে গেল।

নারী-কণ্ঠের অতি মৃদু হাসির শব্দ শুনতে পেলে পঙ্খী! মেয়েটি বললে—গাইলাম, কিন্তু কালা শুনলে কই?

—ওই তোমার এক ঢং! আর তীর্থে কাজ নেই। চল ফিরে চল।

—নাঃ। বয়স অনেক হ'ল। অন্ধকার হয়ে আসছে দুনিয়া। আর—

অসহিষ্ণু পঙ্খী বলে উঠল—কিছু দয়া হবে মা? অন্ধ—

তার হাতে এসে পড়ল কি একটা।

পুরুষটি বললে—আধুলি; পয়সা নয় রে বেটা।

—আধুলী?

—হ্যাঁ।

আধুলী? মেকী নয় তো? হাত বুলিয়ে—মাটিতে ফেলে শব্দ পরখ ক'রে নিলে পঞ্চী। তারপর পরম কৃতজ্ঞতাভরে হাত বাড়িয়ে মেয়েটির পায়ে হাত বুলিয়ে প্রণাম করলে।

তারা চলে গেল। পায়ের শব্দ উঠল।

পাখীরা ডাকছে। দিন বোধ হয় শেষ হ'ল। পঞ্চীও উঠল।

———

শবরী

ক্যারমবোর্ডের একধারে ছটকে-পড়া গুটী হঠাৎ বেঠিক-মারা অন্য গুটার আঘাতে পকেটে পড়ার মতই ফণিচন্দ্র নিতান্ত অকারণে অন্য লোকের ধাক্কায় জেলের গাড়ী অর্থাৎ প্রিজন্-ভ্যানের পকেটস্থ হয়ে গেল।

পাড়াগেঁয়ে চাষী কৈবর্তের ছেলে। বাপ ঋণের দায়ে পৈত্রিক জমি বিক্রী ক'রে গ্রামেই জাতি-জ্ঞাতিদের চাষের কাজে মজুর খাটে। মা-মরা ছেলেটিকে দিয়েছিল একজনের বাড়ীতে গরুর সেবা, অর্থাৎ রাখালী করতে। হঠাৎ পাশের গ্রামের বাবুদের বাড়ীতে ছোকরা চাকরের চাকরী জুটে গেল। ফণি সেখানে থেকে হঠাৎ চালান হ'ল কলকাতায়। বাবুদের বাড়ীর জামাই থাকেন কলকাতায়, তিনি এলেন শ্বশুরবাড়ী, ফণিকে তাঁর বড় পছন্দ হয়ে গেল। তিনি চেয়ে নিলেন ফণিকে। বাপ ভীরু লোক, কলকাতা সম্বন্ধে আতঙ্ক তার অনেক ;—কলকাতার জলে নোনা ধরে, কলকাতায় রাস্তায় নামলেই গাড়ী চাপা পড়ে, গলিতে ঢুকলে গোলকধাঁধার মত হারিয়ে যায়— এঁকে বেঁকে ডাইনে বাঁয়ে সোজা যে দিকেই যাক না কেন মানুষ, গলির আদিও মেলে না, অন্তও পাওয়া যায় না। যদি যায় তখন মানুষ নিজেকে হারিয়ে ব'সে থাকে। নিজের নাম পর্যন্ত ভুলে যায়। কলকাতায় জোচ্চরে ঠকায়, গাঁটকাটায় পকেট কাটে, গুণ্ডায় ঠেঙায়, ছোরা মারে। তাতেও যদি কেউ বাঁচে—তখন আছে কলকাতায় ভেল্কী, সে ভেল্কীতে একবার পড়লে— ত্নিয়া ভুলে যায় মানুষ। ফণি তার মা-মরা ছেলে ; অনেক কষ্টে তাকে বাঁচিয়েছে—এতবড়টা ক'রে তুলেছে। সে হাত জোড় ক'রে বললে—আজ্ঞে বাবু, তা' হ'লে আমার নিঘ্যাত মিত্যু হয়ে যাবেন।

ফণি কিন্তু ভাল মানুষ নয়, বর্ষার পোণা মাছের মত লাফিয়ে চলা তার অভ্যাস—যেমন মাছের মায়ের বারণ-না-মানা ছানা পুকুরের বাঁধের ওপাশে বন্যার জলের গন্ধ পেয়ে লাফিয়ে গিয়ে পড়ে বন্যার বুকে—তেমনি ক'রে বাপকে লুকিয়ে বাবুদের জামাইয়ের সঙ্গে ফণি কলকাতায় চ'লে গেল। রেলে চড়লে, হাওড়ায় নেমে আলো দেখে অবাক হয়ে গেল—ট্রাম, মোটর, রিক্সা, মানুষের ভিড় দেখে ভয়ও পেলে প্রথমটা। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই কলকাতার কায়দা সে জেনে নিলে। দুরন্ত ছোট ছেলে,—ঘাটের অল্প জলে হাত-পা নিয়ে হুল্লোড় করা যাদের অভ্যাস, তারা বেশী জলে পড়লে অভ্যাস করা হাত-পা ছোড়ার দৌলতে হঠাৎ যেমন সাঁতার শিখে যায়, তেমনি ভাবেই কলকাতা সমুদ্রে পানকৌড়ির মত সে ভাসতে লাগল— এমন কি কিছুকালের মধ্যে ডুব সাঁতার কাটার মত পারদর্শিতা লাভ করল। কয়েকদিনের মধ্যেই সে বাবুরবাড়ী পাড়াটা চিনে ফেললে, গলি চিনলে, বড় রাস্তার মোড় চিনলে—বড় রাস্তার পথ চিনে, ফুটপাথ চিনলে—বাবুর মুদীর দোকান, মিষ্টির দোকান, পান-সিগারেটের দোকান থেকে বাজার পর্য্যন্ত চিনে নিলে। দর থেকে দস্তরীর কায়দায় পর্য্যন্ত সে লায়েক হয়ে উঠল। ভাল ক'রে চুল ছাঁটলে, বাবুদের বাড়ীর একটুকরো সাবান সংগ্রহ করলে, একখানা ছোট আয়না-চিরুণী কিনলে। বাবুরা এসেই দুটো হাপপ্যাণ্ট, একটা পুরণো কামিজ দিয়েছিলেন—সেগুলোর জন্যে একখানা কাপড়-কাচা সাবান পর্য্যন্ত কিনে ফেললে—যার থেকে বুঝা যায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার স্বাস্থ্যতত্ত্ব না বুঝলেও ও দুটির রূপতত্ত্বের মহিমা ওর হৃদয়ঙ্গম হয়েছে। পাড়া চিনে নেওয়ার পর ক্রমে ক্রমে সে গোটা কলকাতাটাকেই চিনে নিলে। বড় রাস্তা থেকে বস্তির গলি পর্যন্ত চিনলে, নিজেদের চাকর ও ঝি-সমাজ আবিষ্কার করলে। ঠিকে এবং চব্বিশ ঘণ্টার কাজের মর্ম হৃদয়ঙ্গম করলে। মাইনের রেট জানলে, মাসে পাওনা ছুটির রেওয়াজ জানলে। অবশেষে একদা ফণি মাইনের রেট নিয়ে বিনীতভাবে আবেদন জানিয়ে, ভদ্রভাবে তর্ক ক'রে,

মাইনে বাড়িয়ে নিতে অকৃতকার্য হয়ে—সন্ধ্যার পর পানকৌড়ির মত ডুব মারলে। কায়দা সে ভালই শিখেছিল—সেই কায়দা-মাফিক জরুরী অজুহাত দেখিয়ে—এর আগেই মাইনেটা হালফিল শোধ ক'রে নিয়েছিল। নতুন মাসের তিন-চারদিন খাটনীটা অমনি গেল শুধু, তার বদলে ফণি বাবুর একজোড়া চলনসই পুরণো জুতো পায়ে একটু বড় হওয়া সত্ত্বেও পুঁটলীতে বেঁধে নিলে। কাগজ এবং ন্যাকড়া গুঁজে বেশ চলবে—সেটা সে দুপুরে পায়ে দিয়ে দেখে নিয়েছিল, অভ্যাস করেছিল খানিকটা। জামাই বাবুর বাড়ীতে ছ'মাস, এক ব্যবসাদার বাবুর বাড়ী তিন মাস, একজন সরকারী বড় চাকরে বাবুর বাড়ী এক বছর, একটা চায়ের দোকানে এক বছর, তারপর এল মেসের চাকরীতে। দু-তিনটে মেস ঘুরে সে আবিষ্কার করলে মেসের মধ্যে চাকরের 'স্বর্গ' হ'ল কলেজী ছেলে বাবুদের মেস। এখানকার চাকরী অবশ্য সব চেয়ে কঠিন,—ছুটোছুটিতে এখানে পক্ষীরাজ হতে হয়, বোঝা বইতে হ'তে হয় ঐরাবত, চড়-চাপড় খেতে হ'তে হয় গাধা, বকুনী ও গালাগালি শুনতে বাঁদর হ'তে হয় অর্থাৎ শুনেও দাঁত মেলতে হবে—ভ্যাংচানীর ভঙ্গিতে নয়, হাসির ভঙ্গিতে। তা হোক—তা হ'লেও এখানকার চাকরী সব চেয়ে ভাল। কারণ বাবুরা দয়াতে আশুতোষ, দানে কর্ণসেন, আমিরীতে দিল্লীর সাহানশা বাদশা। পুরণো জামা-কাপড়ের খেলাত, পুরণো জায়গীর রাখতে জায়গা হয় না চাকরের পুটলীতে কি টিনের প্যাটরায়। ফণিও প্রচুর পেলে। অবশেষে এইখানে একদা মিলল তার শিরোপা—টুপি পর্যন্ত মিলল একটা। উনিশশো একুশ সালের পর। বাবুরা তখন টেরী ঢেকে টুপি পরতে আরম্ভ করেছে, গান্ধী-টুপী। সেই টুপী একটা তার মিলে গেল। দুপুর বেলা ছুটি—বাবুরা যায় কলেজে—সেইটা বেড়াবার সময়। আগে জুতো জামা প'রে ফণি বেড়াতে যেত। এইবার সে টুপীটা এঁটে বেরুতে সুরু করলে। হঠাৎ ওই টুপীটার জন্যই একদিন একটা জনতার ধাক্কা খেতে খেতে জেলের গাড়ীর পকেটে ঢুকে গেল। আন্দোলন থেমে এসেছে, নেতারা জেলে, তবুও তখন মধ্যে মধ্যে দুটো একটা ছোট-খাটো

আন্দোলন লেগেই আছে। এমনি একটা ছোট-খাটো আন্দোলনের আবর্ত অর্থাৎ পুলিস ও ভলেন্টিয়ারের জনতা ফণির চোখে পড়ল। সে কৌতূহলী হ'য়ে এগিয়ে গেল। মাথায় তাজের কথাটা তার খেয়াল ছিল না। বরং এ আক্কেলও তার ছিল না যে জীবনে তাজই সব। যুদ্ধক্ষেত্রে রাজার তাজ না দেখতে পেয়ে বড় বড় যুদ্ধে জিতের বাজীতে হার হয়ে গিয়েছে। হলদীঘাটের যুদ্ধে একজন সর্দার রাণাপ্রতাপের তাজ কেড়ে নিজের মাথায় প'রে প্রাণ দিয়েছিলেন—রাণা রক্ষা পেয়েছিলেন। সুতরাং দোষ পুলিসেরও নাই। মাথায় টুপী দেখে ঘা কয়েক ব্যাটন লাগিয়ে—তাকেও তারা টেনে পুরে দিলে ওই গাড়ীটার ভেতর। পুকুর থেকে ছোট মাছ তুলে এনে বড় বড় মৎসাবতারের রাজ্যের মধ্যে তাকে ছেড়ে দিলে। বড় বড় নেতারা ছিলেন যে জেলে—ফণিকে ঢুকিয়ে দিলে সেই জেলে।

জেল থেকে বেরিয়ে কলকাতায় কয়েকদিন কাটিয়ে সে দেশে ফিরল।—একটা চরকা, একটা তকলী, খানিকটা তুলো, একটা তিনরঙা পতাকা, টিনের সুটকেশ এবং বিছানার বাণ্ডিল নিয়ে। অর্থাৎ কলকাতা ত্যাগ ক'রে স্থায়ীভাবে দেশে এল। প্রায় ছ' বছর কলকাতায় থেকে সেখানকার মাল-মশলায় জীবনে খানসামাগিরির যে ইমারতখানি সে গড়ে' ছিল—ছ' মাস জেলে থেকে তার আমূল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। খাপরা ছাওয়া বস্তীর ঘর যাদুকরের যাদুতে যেন একেবারে পাল্টে গিয়েছে। বড়লোকের তিনতলা দালান অবশ্য হয় নি—কিন্তু গরীব ভদ্র গৃহস্থের চুণকাম-করা, সে-কালের দশটাকা-ভাড়ার বাসাবাড়ীর চেহারা নিয়েছে। জেলে যাবার আগে তার মাথায় ছিল বড় বড় চুল—লম্বায় এক বিঘতের চেয়েও দু' এক আঙুল বড়, মাথা ঝাঁকি দিয়ে সে-গুলোকে সে মধ্যে মধ্যে নাচাতো,—সে চুল কেটে ছোট ক'রে ফেলেছে ; কামানো বন্ধ ক'রে কচি কচি দাঁড়ি-গোঁফে মুখখানাকে কচি ধানের ক্ষেতের মত ক'রে তুলেছে। ছোট ক'রে চুলছাঁটা মাথার ভিতর মগজেও অনেক ওলোট-পালোট হয়েছে। পলাশীর যুদ্ধ, তাঁতীর

আঙুল কাটা থেকে সে দিনের জালিনওয়ালাবাগ পর্যন্ত ঘটনা সেখানে ঠাঁই পেয়েছে; এখানকার রায়বাড়ী আর চৌধুরী বাড়ীর তিনপুরুষ ধরে দাঙ্গা এবং মামলার কাহিনীর ঠিক পাশেই বাসা বেঁধেছে। প্রতিজ্ঞা করেছে—পরের এঁটো বাসন, ছাড়া কাপড়, পায়ের জুতো, শোয়া বিছানা, ঝাড়ু এবং ঝাঁতা এ ঘেঁটে রোজগার ক'রে বাঁচার চেয়ে না-খেয়ে মরা ভাল। কাজেই দেশে ফিরতে হ'ল।

ঘর দোর খাঁ-খাঁ করছে। বাবা নাই। তিন মাস আগে সে মারা গিয়েছে। ফণি তখন জেলে। জ্ঞাতিগোষ্ঠি ছাড়া আপনার জন কেউ ছিল না—খবর কে দেবে; আর খবর দেবেই বা কোথায়? ছেলের খবর না পেয়েই তো গোবিন্দদাস বিছানা পেতেছিল।

ফণি মাথায় হাত দিয়ে দাওয়ার উপর ব'সে পড়ল। চোখ দিয়ে জলের ধারা নেমে এল। বাপের মুখখানা পর্যন্ত সে মনে করতে পারলে না। শেষবার সে বাড়ী এসেছিল বছরখানেক আগে। জেলে যাবার মাস কয়েক আগেই বটে। ফণির আগমনে পাড়া-পড়শীরা অনেকেই এসেছিল। কলকাতার হাওয়া-লাগা ফণি অনেক দিন থেকেই লোকের কাছে বিস্ময়ের বস্তু। নিন্দা বা প্রশংসা, ভালোবাসা অথবা হিংসা—এর একটা না একটা প্রত্যেকেই তাকে দিয়ে থাকে—অবহেলা ক'রে কেউ থাকতে পারে নাই! এবার তারা এল অধিকতর বিস্ময় নিয়ে। ছ' মাস সে কোথায় ছিল? কলকাতা থেকে সে কি দিল্লী-লাহোর গিয়েছিল না বোম্বাই-মাদ্রাজ কোথায় গিয়েছিল?

সকলেই তাকে সান্ত্বনা দিলে—কি করবে বল—তার অদেষ্ট—আর তোমার ভাগ্যি। বেটার সেবা—পুত্তের আগুন তার অদেষ্টে ছিল না—তোমার ভাগ্যেও ছিল না। তুমি তো আর জেনে শুনে 'রবহেলা' (অবহেলা) কর নাই।

—কিন্তুক—একটা চিঠি—দিতে তো পারতিস্? না—তা পারতিস্ না?

একখানা পোষ্টকার্ট। তাতে তো আর লাখ পঞ্চাশ খরচ নয়। দু' লাইন নিকে—সাকিম-মোকাম যদি জানাতিস—তবে তো এখান থেকে খবর দিতে পারতাম আমি। আঃ—চিঠি দিলে আর সে মরবেই বা ক্যানে? খবর না পেয়েই তো বিছানা পাতলে সে। দিনের মাথায় না হোক একশো বার বলেছে—সর্‌লা—শ্যাষ (শেষ) কালে ছেলেটা অকালে মরল রে! আর দু'চক্ষে বসুধারা বয়ে যেত।

ফণি মাথা হেঁট করলে। জেলের কথা মনে হ'ল। জেলের মধ্যে বড় বড় স্বদেশী বাবুরা নিজেরা যখন চিঠি লিখতেন তখন তাকেও চিঠি লেখার কথা বলতেন। কি—কি ফণি বাড়ীতে চিঠিপত্র দেবে না তুমি?

জেলের নিয়মে মাসে মাসে চিঠি লেখার অধিকারের কথাও সে জানত, মনেও হ'ত মধ্যে মধ্যে। কিন্তু তার বাপের উত্তরের চেহারা কল্পনা ক'রে সে লজ্জা পেত। পোষ্টকার্ড অথবা খামের মধ্যে ময়লা বালী কাগজে আঁকা বাঁকা লাইনে বিশ্রী হরফে বাপের উত্তর আসবে—বানান ভুল থাকবে, কান্নাকাটি থাকবে—"বাবাজীবন, তোমার জেহেল হইয়াছে 'খপর' পাইয়া আমার মাথায় 'বজ্‌জাঘাত' হইল। ভয়ে পরাণ উড়িয়া যাইবার 'উপক্যম' হইয়াছে। ভগবান শেষে আমার কপালে এই 'নিকিয়াছিলেন।' 'দিনরাত্ত' কাঁদিতেছি। ইহার 'পূব্যে' আমার 'মিত্যু' হইল না কেন?"

বাবুরা সে চিঠি পড়বে—হাসবে—এই ভেবে সে চিঠি লেখে নাই। ভেবেছিল—ছ' মাস তো! দেখতে-দেখতে কেটে যাবে। কিন্তু বাপ যে তার ম'রে যাবে এ কথা সে ভাবে নাই।

সর্‌লা পিসী বললে—কি? কথার জবাব দিস না যে রে? এ্যাঁ? এ্যাঁ, ইদিকে আবার মাথায় একটা টুপি চড়িয়েছে! বলি, এতদিন ছিলি কোথা শুনি?

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে ফণি বললে—উপায় থাকলে কি আর চিঠি

দিতাম না পিসী? উপায় ছিল না। ছ' মাস ছিলাম জেলে, খালাস পেয়েছি চারদিন আগে। খালাস পেয়েই ছুটে আসছি।

সমস্ত লোক ঠিক এক সঙ্গে চমকে উঠল। 'জেল—জেলে ছিল ছ' মাস!' সর্বনাশ! ছি! ছি! ছি!

সরলা পিসীও চমকে উঠেছিল; কয়েক মুহূর্ত পর হঠাৎ সে ফণির মুখের কাছে হাত নেড়ে বললে—ঝাঁটা মারি তোর মুখে। আস্তাকুঁড়ের ঝাঁটা মারি! জেহেলে গিয়ে ছিলি তু'? তু' জেহেলে গিয়েছিলি? গোবিন্দদাদার ছেলে তু', দেবতার মতন মনিষ্যি ছিল তোর বাবা, তু জেহেলে খেটে এলি? আস্তাকুঁড়ের মুড়ো ঝাঁটা তোর কপালে মারি আমি। কি করেছিলি? চুরি? না ফোজদারী? কি করেছিলি—বল না ক্যানেরে মুখপোড়া—ওরে—ওরে —ও বাঁশবুকো ··ড্যাকরা—।

একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে ফণি বললে—চুরি ফোজদারীর জেল নয় পিসী—এ হ'ল স্বরাজের জেল। অহিংস অসহযোগ। মহারাজ গান্ধীর হুকুমে জেলে গিয়েছিলাম আমি।

সমবেত লোকেরা আবার চমকে উঠল। অন্ধকার রাত্রে দূরান্তরে ঘনবসতি বাজারে-হাটে-লাগা আগুনের আলোয় লালচে আকাশের ছটার মত স্বরাজ গান্ধীর খবরটা আবছা-আবছা পেয়েছে তারা। বড় বড় লোক, এ জেলার সব চেয়ে বড় উকিল একজন—একজন ডাক্তার নাকি 'জেহেলেও' গিয়েছে। পাশের গাঁয়ের বাবুদের দু'জন ছোকরা 'জেহেলে' যাবার জন্যে গিয়েছিল, কিন্তু 'জেহেলে' তাদের নেয় নাই, নাকে খত দিইয়ে বাড়ী ফেরৎ পাঠিয়েছে। সেই 'জেহেলে' গিয়েছিল ফণি!

সকল লোকের কথা থাক—সরলা পিসী যে সরলা পিসী সে পর্যন্ত অবাক হয়ে গেল।

সরলা পিসী তো যে সে লোক নয়। গোটা গাঁয়ের লোক তাকে ভয় করে—সমীহ করে। বয়সের দিক থেকে এক রত্তি মেয়ে সরলা—ত্রিশেরও নিচে,

সাতাশ, ফণির চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের বড়—কিন্তু বয়সের ওজনে সরলার গুরুত্ব মাপা যায় না। সাতাশ বছর বয়সেই সে সাতচল্লিশ বছরের গুরুত্ব অর্জন করেছে। সবল স্বাস্থ্য, রূঢ় দৃষ্টি, কটু কঠোর কণ্ঠস্বরের সাহায্যে বিশ্ব-সংসারে স্বজনহীন নিঃসন্তান সরলা বৈধব্যের কয়েক বৎসরের মধ্যেই এ গুরুত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। পৃথিবীতে কাউকে সে ক্ষমা করে না।

তার বাপ মায়ের কথা উঠলে—সে বাপকে বলে—চামার—চণ্ডাল—রাক্ষস! মাকে বলে—রাক্ষসী চণ্ডালী। তাদের পেট ছিল অভর—আমার কপাল খেয়ে পেট ভরিয়েছে!

সরলার বাপের বিষয় ছিল না কিন্তু বিষয়-বুদ্ধি ছিল জটিল। সম্পত্তিশালী এক বৃদ্ধের সঙ্গে সরলার সে বিবাহ দিয়েছিল নগত আড়াই শো টাকা গুণে নিয়ে; এ ছাড়া জামায়ের সঙ্গে সর্ত্ত ছিল—জামাই সম্পত্তির অর্ধেক লিখে দেবে সরলার নামে। কিন্তু বেচারী বুদ্ধির জটে নিজের পরমায়ুকে জড়াতে পারে নি, তাই লেখাপড়ার আগেই হঠাৎ সরলার বাপ মারা গেল। কিছুদিন পর সরলার সংস্থান ক'রে দেওয়ার সঙ্কল্প মনের মধ্যে পোষণ করেই সরলার বৃদ্ধ স্বামীও মারা গেল, সঙ্গে সঙ্গেই সরলার সতীন পো দু'জন—প্রায় ঘাড় ধরেই তাকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিলে। সরলা আশ্রয় নিলে এসে মায়ের কাছে: এ সব ঘটনা—অনেক দিনের; ফণি তখনও কলকাতায় যায় নি; ফণির বয়স তখন বারো-তেরো—সরলার আঠারো-উনিশ। সরলার মায়ের তখন এদিকে হাতে ভাঁড় নেবার অবস্থা; সরলাকে বিক্রী করার আড়াই শো টাকার কতকটা সরলার বাপ বেঁচে থাকতে খেয়েছিল। কতকটা খেয়েছিল ম'রে শ্রাদ্ধকর্মে, বাকী যা' ছিল—তা'ও সরলার মা খেয়ে তখন শেষ ক'রে এনেছে। সরলা মায়ের বাড়ীতে এসে—নিজের গহনা বিক্রী ক'রে কিনলে দুটি গাই—আর ছুতোর ডেকে তৈরী করিয়ে নিলে একটা ঢেঁকি। গাঁয়ের কাহার বাউরীর মেয়েদের সের করা দু' পয়সা মজুরী ঠিক ক'রে—গাইয়ের দুধ বিক্রী আরম্ভ করলে এবং বাবুদের গাঁয়ের ভদ্রজনের ধান এনে—চাল তৈরী আরম্ভ করলে। মায়ের সামনে ভাতের থালা

নামিয়ে দিয়ে বললে—"নাও—পিণ্ডি গেলো। চণ্ডালী—তুমি রাক্ষসী।" মা ম'রে গিয়েছে—পিণ্ড আর সরলা দেয় না—কিন্তু চণ্ডালী রাক্ষসী গালাগালি সে এখনও দেয়। স্বামীর কথা উঠলে বলে—"নিব্বংশের ব্যাটা নিব্বংশে—আমার দুষমণ—জন্ম জন্ম যেন নরকে পচতে থাক তুমি। সতীন পোদের নাম সে করে না—স্বামীকে 'নিব্বংশে' বলেই তাদের পাওনা সে শোধ করে।

শুধু গ্রামের নয়, ওই বাবুদের গ্রামে যাদের 'ধান ভেনে' সে খায়—তাদের বাড়ীতে পর্যন্ত সরলা আদি এবং অকৃত্রিম সরলা। বাবু বলে সম্ভ্রম করে না, ওদেরই ধানের কল্যাণেই তার অন্ন—এ বলেও কোন বিনয় নাই। এই সেদিন বাবুদের বাড়ীর প্রৌঢ়া বিধবা মেয়ে অতিরিক্ত চাপ দিয়ে সেরে চাল মাপছিল; দেখে সরলা বলেছিল—মাঠাকরুণ, চাল তো তুলো নয় যে টিপলে বেশী ধরবে! সেরের মাথায় চেপে যদি নেচে নেচে নাচো মা, তাতেও ধরবে না। তার চেয়ে—সেরের ভেতরটা চেঁচে দিয়ো। আর আজকের মত না হয় আঙ্গুল কেটে সেরের মাথায় বেড়া দাও। বুঝলে।

এই যে সরলা—সেও অবাক হয়ে গেল ফণির কথা শুনে। অবাক হবারই কথা। এই যে ব্যাপারটা যেটা এ গ্রামের লোকের কাছে দূরান্তের জনপদের বসতি পোড়ানো আগুনের ছটা-লাগা আকাশের মত—সেটা সরলা খুব কাছে থেকে দাঁড়িয়ে দেখেছে। ওই বাবুদের গ্রামে সরলা প্রতিদিন না হোক—দু-এক দিন অন্তর নিয়মিত যায়, সেখানে সে তিনরঙা ধ্বজা পতাকা দেখেছে, বাবুদের বাড়ীতে মোটা চটের মত কাপড় শুকুতে দেখেছে, ছেলেদের মিছিল দেখেছে, আবগারীর দোকানের সামনে হোমরা-চোমরা বাড়ীর ছেলেদের 'পিকেটিং' করতে দেখেছে। দেখে শুনে সে গালে হাত দিয়েছিল। সে কি কাণ্ড! হোমরা-চোমরা বাবুরা কথায় কথায় পায়ের জুতো খুলে যে সব লোকের পিঠে বসিয়ে দেয়—আনকোরা নতুন জুতো মারতে মারতে ছিঁড়ে গেলেও ক্ষতি হ'ল বলে যারা আফশোস করে না—তাদের বাড়ীর ছেলে হাতজোড় ক'রে, পায়ে ধ'রে, মাতাল-গাঁজাল-আফিংখোর ইতর লোককে

মদ গাঁজা খেতে বারণ করেছে। বলেছে—গান্ধীজীর উপদেশ। বাবুদের দু' জন ছেলে জেলে যাবার জন্য গিয়েছিল। সেদিন সরলা উপস্থিত ছিল ওখানে। চোর ডাকাত জেল যায়—হাতে হাতকড়ি এঁটে, কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে যায় লাল-পাগড়ী-পরা পুলিস; যারা যায় তারা যায় শুকনো মুখে; লোকে দেখে বলে—"শালা চোর। 'চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে—যদি না পড়ে ধরা'। 'ধরা পড়লেই মরা'—যাও বাবা এইবার ঘানি টেনে এস! হুঁ-হুঁ।" আর এরা গেল—সে যাবার রকমই আলাদা। গাঁয়ের লোক—মেয়ে ছেলে ভেঙে এল ইষ্টিশানে। হাতে হাতকড়ি নাই—কোমরে দড়ি নাই—তার বদলে গলায় একরাশ ফুলের মালা প'রে—হাসতে হাসতে গেল। মেয়েরা সব শাঁখ বাজালে—খই ছড়ালে—জয় জয়কারে আকাশ ফাটিয়ে দিলে—গান্ধীর জয়। বন্দেমাতরম! আর ঐ ছেলেদের নাম ধ'রে জয়। চব্বিশ প্রহরের হরিধ্বনির মত। সঙ্গে সঙ্গে দারোগা কনেষ্টবল গেল চোরের মত। তাও সে ছেলে দুটিকে নেয় নাই জেলে। নাকে নাকি খত দিইয়ে ফেরৎ দিয়েছিল। এসব এ গাঁয়ের লোকের শোনা কথা—সরলার চোখে দেখা।

ফণির বাবা গোবিন্দ ছিল হাবা-গোবা মানুষ। কেউ চড় মারলে গালে হাত বুলাতো—কিন্তু বলতে পারতো না কখনও—মারবে ক্যানে হে বাপু। তার ছেলে ফণি। সরলা গল্প শুনেছিল এক সিদ্ধপুরুষ মুনিঋষির। ইঁদুরের বাচ্চাকে মন্তর প'ড়ে বাঘ ক'রে দিয়েছিল। গোবিন্দ দাদার ছেলে ফণির বৃত্তান্তটা যে সেই বৃত্তান্ত।

হঠাৎ সরলার চোখে জল এসে গেল। চোখের জল মুছে সে বললে—আঃ, আজ গোবিন্দদাদা থাকলে—সে একদিকে কাঁদত একদিকে হাসত। তা আয়, উঠে আয়, আমার বাড়ীতে আয়। ছাই ফেলতেও ভাঙা কুলোর তো বিনাশ নাই—ক্ষয় নাই; অক্ষয় অমর—হতভাগী আমি তো আছি—আয়।

বৈকালে এল লাল-পাগড়ী মাথায় এঁটে পুলিস। —ফণি কৈবত্ কোন বাড়ী?

ফণিকে চিনতে কষ্ট হ'ল না, সরলা পিসীর দাওয়ায় ব'সে সে চরকা কাটছিল। সিপাহীজী এসে বললে—চলো—থানায় দারোগাবাবু ডাকিয়েসেন।

ফণি তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে—ওয়ারেণ্ট কই?

সিপাহীজী একটু ভড়কে গেল। বললে—ওয়ারেণ্ট নেহি। দারোগা বাবু ডাকিয়েসেন।

ফণি বলে দিলে—বিনা ওয়ারেণ্টে হামি নেহি যায়েগা। দারোগাবাবুর আমি নোকর নই, প্রজা নই, খাতক নই। কাহে যায়েগা?

সরলা যে সরলা সেও আড়ষ্ট হয়ে গেল। হাত-পা নাড়বার শক্তিও তার হারিয়ে গিয়েছে যেন।. ফণি বলছে কি?

সিপাহীটাও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সবিস্ময়ে বললে—নেহি যায়েগা তুমি?

ফণি বললে...ওয়ারেণ্ট থাকে তো যায়েগা। নেহি থাকে নেহি যায়েগা। জোর ক'রে ধরে নিয়ে যায়েগা তো শুয়ে পড়েগা—টানতে টানতে নিয়ে যানে হোগা। হাসতে লাগল ফণি।

সিপাহীটা চ'লে গেল। শাসিয়ে অবশ্যই গেল; কিন্তু তাতে ফণির হাসি বেড়ে গেল। হঠাৎ তার দৃষ্টি পড়ল সরলা পিসীর উপর। ছাইয়ের মত পাঁশুটে হয়ে গিয়েছে সরলা পিসীর মুখ। সে ডাকলে—সরলা পিসী।

সরলা এবার হাসবার চেষ্টা করলে।

—বস, পিসী বস। ভয় লাগল নাকি?

সরলা অস্বীকার করলে না—সে এসে বসল তার পিঠের কাছে। পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে—ভয় একটুকুন লাগছিল ফণি।

ফণি হাসতে লাগল। ভয় কি? তারপর সে আরম্ভ করলে ছোট-খাটো একটি বক্তৃতা। জেলখানায় সে যা শিখে এসেছিল—সেই সব বেশ

বীরত্ব সহকারে বীররস সহযোগে বলতে আরম্ভ করলে। বলতে বলতে চরকা বন্ধ হয়ে গেল। সরলা পিসীর মুগ্ধ বিস্মিত মুখের দিকে চেয়ে সে তার দিকে ফিরে বসল। —"এ হ'ল এক রকম যুদ্ধ, জান পিসী! কাটাকাটির যুদ্ধ নয়—অহিংস যুদ্ধ। গেরেপ্‌তার করতে চায়—হাত বাড়িয়ে দোব, জেলে দিতে চায়—চলো জেলে, গুলী করতে চায়—দাঁড়াব বুক পেতে। মার গুলী।" ফণি উঠে বুক ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে দেখিয়ে দিলে কেমন ভাবে সে গুলী খাবার জন্য নির্ভয়ে দাঁড়াতে পারে।

রূঢ় দৃষ্টি সরলার চোখে যেন রূপান্তর ঘটে যাচ্ছে। স্মিতদৃষ্টিতে ফণির দিকে চেয়ে মৃদু হেসে সে সস্নেহে বললে—বস বাপু। তোর কথা শুনে কি হচ্ছে আমার—হ্যাঁ। খুব বীর তুই। বস।

হাত দুটো উপরের দিকে তুলে ফণি আড়মোড়া ছেড়ে বললে—বসে থেকে পিঠটা টন-টন করছে। একটুকুন ছাড়িয়ে নি দাঁড়িয়ে।

তার হাত ধ'রে টেনে সরলা বললে—তবে আমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড় খানিক। মাথায় হাত বুলিয়ে দিই।

শুয়েও ফণির বক্তৃতা থামে না। সে বকেই যায়।—জান পিসী, স্বরাজ না হ'লে আমাদের ছুটি নাই।

স্বরাজ কথাটা সরলা শুনেছে—কিন্তু বুঝতেও পারে নাই, বুঝবার চেষ্টাও করে নাই কোনদিন। আজ কিন্তু সে স্বরাজকে অবহেলা করতে পারলে না। বললে—স্বরাজটা কি রে? সবাই তো বলে স্বরাজ স্বরাজ।

ফণি স্বরাজের ব্যাখ্যা করে।—স্বরাজ, গান্ধীজীর স্বরাজ। গান্ধীর রাজ্য।

—গান্ধী কে? গান্ধী গান্ধী তো অনেক শুনেছি।

—মহারাজ গান্ধী।

—মহারাজ? রাজা নেকিনি সে?

—হ্যাঁ। মহারাজ গান্ধী।

—মহারাজা গান্ধীকে তুই দেখেছিস?

সরলা পিসীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার সে মুখ দেখে ফণির মিথ্যে কথা বলতে ইচ্ছে হ'ল। দেখি নাই ব'লে নিজের গৌরবকে খাটো করতে তার মন খুঁত-খুঁত ক'রে উঠল। সে বললে—হ্যাঁ। দেখেছি বৈকি।

সরলা নীরবে ফণির চুলের গোড়ায় হাত বুলিয়ে দেয় আর ভাবে। জমিদার বাড়ীতে জমিদারের সঙ্গে দেখা করারই হাঙ্গামা কত। দারোয়ান-খানসামা, নায়েব-গমস্তার সুপারিশ চাই। দেউড়ী থেকে দোতলার খাস কামরা—বারান্দা—দরদালান—সিঁড়ি—সে ঘুরপাক কত! আর এ হ'ল মহারাজ—মহারাজ গান্ধী। যাত্রার আসরে প্রভাস যজ্ঞ পালার কথা মনে পড়ল তার। গোকুল থেকে যশোদা গিয়েছিলেন—ক্ষীর-সর-ননী নিয়ে দ্বারকায়; তাঁর গোপাল রাজা হয়েছে—তাকে দেখতে গিয়েছিলেন। দ্বারী তাঁকে ঢুকতে দেয় নি। আর মহারাজার সঙ্গে ফণি—এই গাঁয়ের গোবিন্দ-দাদার ছেলে, জাতে কৈবর্ত্ত, সে দেখা ক'রে এল!

ফণি পরম আরামে পিসীর কোলে মাথা রেখে শুয়ে গল্পই ক'রে যায়।—জান পিসী, রামচন্দ্র চোদ্দ বছর বনে গিয়েছিলেন, বাকল পরেছিলেন, মাথায় জটা বেঁধেছিলেন। তারপর এসে 'অযোধ্যায়' সিংহাসনে ব'সে রাজা হয়েছিলেন। 'জান তো? মহারাজ গান্ধী এক যুগ জেহেলে থাকবেন। তারপর রাজ্য পাবেন। আমাকেও আবার জেহেলে যেতে হবে। হুকুম এলেই যাব।

সরলার চোখ আবার জলে ভ'রে ওঠে।

—না—না। সে হবে না ফণি। তোর বিয়ে দোব, ঘর-সংসার করবি, ছেলে-পুলে হবে। না—না ও সব করতে তুই পাবি না আর।

ফণি ঘাড় নাড়তে আরম্ভ করলে। অনেকক্ষণ ধ'রে ঘাড় নাড়লে। যেন অনেক বিবেচনা ক'রে অনেক ভেবে—গভীর গুরুত্বের সঙ্গে অস্বীকার করলে।—উঁ—হুঁ। উঁ—হুঁ। সে উঁহুঁ।

সরলা ধমক দিয়ে বললে—বেশী চালাকী করিস না।

ফণি হাসলে এবার। বিজ্ঞ মানুষে—বিষণ্ণতার সঙ্গে হেসে যেমন হতাশ ক'রে দেয় মানুষকে তেমনি হাসি।

হঠাৎ মাতুমাসীর গলার সাড়া পেয়ে তারা দু'জনেই চমকে উঠল। মাতুমাসী মাতঙ্গিনীর বিক্রম—সরলার চেয়ে কম নয়। কিন্তু মাতুমাসী সরলাকে ভয় করে। তার কারণ মাতুমাসীর অনেক দুর্নাম আছে। সরলার পিছনের দিকে রাস্তার উপর কখন এসে দাঁড়িয়েছিল মাতুমাসী। গলার আওয়াজে পিছন ফিরলে সরলা, ফণিও ঘাড় ঘুরিয়ে মাতুকে দেখলে।

—বলি সরলা না কি?

—হ্যাঁ মাসী।

—ওটা—ও মুন্‌সেটা কে লা? তোর কোলে শুয়ে রইচে ওই যে ঐ মুন্‌সেটা?

—মুন্‌সে নয় মাসী—ও ফণি।

—অ—। তা' ফণে বুঝি মুন্‌সে লয়? কচি খোকা? তা বেশ। তা বেশ।

মাতুমাসী আর দাঁড়াল না; খানিকটা গিয়ে কিন্তু হঠাৎ আবার ফিরল। বললে—সরলা।

সরলা তার দিকেই তাকিয়ে বসেছিল। চোখে চোখ পড়তেই মাতুমাসী বললে—তুই কি বুড়ী হয়েছিস সরলা?

সরলা এবার উঠে দাঁড়াল ধনুক ছাড়া তীরের মত।—কি বলছ মাসী?

মাসী হেসে বললে—শুধাচ্ছি বলি মাসের আজি ক'দিন হ'ল বল দেখি নি।

সরলা তাকে বিঁধবার আগেই সে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সরলার সর্বশরীরে যেন জ্বালা ধ'রে গেল। বৈশাখের আকাশে এক-টুকরো মেঘের মধ্যে কাল বৈশাখীর ভূমিকার মত মাতুমাসীর কথাগুলোর মধ্যে গ্রামজোড়া একটা রটনার সম্ভাবনা নিহিত আছে। গ্রামজোড়া কেন,

দেশজোড়া রটনা রটাবে মাতুমাসী। মাতুমাসীর উপর রাগে ক্ষোভে তার অন্তরে জ্বালা ধ'রে গেল। বাবুদের বাড়ীতে একটা আয়না আছে। ছেলে-মেয়েরা সেই আয়নায় মুখ দেখে আমোদ করে। সরলা সে আয়না দেখেছে। সে আয়নায় বাবুদের মুখ ভূতের মত কদাকার দেখায়। মাতু-মাসীর অন্তরটা সেই আয়নার মত। নিজে সমস্ত জীবনটা পাপ করে কুকাজ করে—দুনিয়াতে পাপ আর কুকাজ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না। বৈকালের অবশিষ্ট সময়টা সে কাজ-কর্ম করলে আর আপন মনেই একা গাল পাড়লে—চোখের মাথা খাও তুমি—পিথিবীর আর কিছু যেন দেখতে না পাও তুমি। সু-তে যেমন তুমি কু দেখ, তুমি তেমনি চোখের মাথা খেয়ে অন্নের থালাতে হাত বাড়াতে আস্তাকুঁড়ে হাত দিও তুমি। ভাইয়ের ছেলেতে আর 'গভ্যের' সন্তানে তফাৎ কি? মা বেটার মত বয়সের তফাৎ ফণির আমার নয়—কিন্তু ও যদি আমার সৎ বেটা হ'ত? ও যদি আমার মায়ের পেটের ভাই হ'ত? যে কু-কথা বলবে—তার জিভ খসে যাবে, যে কু দেখবে—তিনি কাণা হবেন—চোখের মাথা খাবেন।

হঠাৎ বাইরে থেকে কে ডাকলে—সরলা আছিস হায়, সরলা।

সরলা কাণ খাড়া ক'রে চোখের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ক'রে দাঁড়াল শব্দচকিত বনের বাঘিনীর মত। হরেরাম কাকার গলার আওয়াজ। মাতুমাসী এর মধ্যেই তা' হ'লে ছোঁয়াচ ধরিয়ে দিয়ে এসেছে হরকাকাকে। মাতু যেমন হারামজাদী হরও কি ঠিক তেমনি হারামজাদা। ওই আবার গাঁয়ের মাতব্বর!

—বলি—সরলা। ও সরলা।

সরলা আবার দাঁত-মুখ বা'র ক'রে রোদের ছটায় সান-দেওয়া ছুরি ঝকমকানির মত ঝকঝকে চোখ নিয়ে বেরিয়ে এল—কি?

দরজার মুখে এসেই কিন্তু সে অপ্রতিভ হয়ে গেল। হরেরামের পিছনে বাবুদের গাঁয়ের ছেলেরা দাঁড়িয়ে। মা গো, ওমা গো। এ মূর্তি দেখে বাবুরা বলবে কি?

হরকাকা এক গাল হেসে বললে—বাবু মশায়েরা আইচেন, ফণির খোঁজে। ফণি কই ?

সরলা মৃদুস্বরে বললে—ছিল তো এইখানে। কোথা গিয়েছে এখন। কি দরকার আমাকে বলেন।

হর বললে—বাবুরা এয়েচেন, ফণিকে নিয়ে 'মেটাং' করবেন।

বাবুদের ছেলেরা হাসলে—বললে—'মেটাং' নয়—মিটিং, মানে সভা।

সরলা অবাক হয়ে গেল। ফণিকে নিয়ে বাবুদের ছেলেরা 'মিটিং' করবে! বাবুদের গাঁয়ে 'মিটিং' সে দেখেছে। 'জজ মেজেষ্টার—সায়েব সুবো' আসে—চেয়ারে বসে—লোকজন সব আসে—'মেটাং' হয়। সায়েবরা বাবুরা সব কত কথা বলে—যাত্রার দলের বক্তৃতার মত—লোকেরা শোনে, হাততালি দেয়। ফণিকে নিয়ে বাবুরা সেই 'মেটাং' করবে ?

বাবুদের গাঁয়ে 'মিটিং' ক'রে ফণি ফিরে এল ফুলের মালা গলায় নিয়ে। বাবুরা ফণিকে বললে—'দেশের বীর সন্তান, মুখ উজ্জ্বল করেছে আমাদের।' সরলা নিজের চোখে দেখেছে—নিজের কাণে শুনেছে। একা সরলা নয়—এ গাঁয়ের হরুকাকা থেকে ছেলেছোকরা অনেকজনই গিয়েছিল। কত ধ্বনি দিলে সব। বন্দেমাতরম, গান্ধী মহারাজার জয়—সেই সঙ্গে তারা 'ফণির জয়' ও বললে।

কাল বৈশাখীর টুকরো মেঘ জয়ধ্বনিতে চাপা প'ড়ে গেল।

চাপা যদি না-পড়ে তো না পড়ুক। সরলার আর দুঃখ নাই তার জন্য। বলুক যে সে বলবে বলুক। ফেরার পথে সকলের সামনেই সে ফণিকে বললে—মালা তুমি ছিঁড়ো না, নষ্ট করতে পাবে না, আমাকে দাও আমি রেখে দোব।

দুপুর বেলা খাওয়ার পর সে দাওয়ার উপর ঘটা ক'য়ে মাদুর বিছিয়ে বসল, ফণিকে শুইয়ে তার মাথা কোলে নিয়ে বললে—'যা দেখি নাই বাবার কালে—তাই দেখালে ছেলের পালে'। তু যাহোক দেখালি বটে ফণি।

ফণি কপালে হাত ঠেকিয়ে প্রণাম ক'রে বললে—পিসী—গান্ধী মহারাজার জয় বুঝলে। সরলা তা' বুঝেছে। নইলে—কৈবর্তরা চিরকাল বাবুদের বলে—আমরা হুজুরদের জুতোর চাকর—সেই কৈবর্তদের ছেলে ফণির এমন আদর হয়। সরলা আর কথা বলে না—চুপ ক'রে বসে ভাবে। মহারাজ গান্ধী। রাজা—মহারাজা সে দেখে নাই। যাত্রার পালাগানে রাজা দেখেছে। ঝলমলে—মখমলের জরি বসানো পোষাক—মাথায় সাদা পালক দেওয়া তাজ—কোমরে তরোয়াল—।

গৌরবলুব্ধ ফণি মিথ্যা কথা বলে যায়—জান পিসী, এ কি মিটিং দেখলে? মহারাজ গান্ধীর মিটিংয়ে লাখ লাখ লোক আসে—দেশ ভেঙে—ঝেঁটিয়ে—ছুটে' আসে। মহারাজার একপাশে থাকে—চিত্তরঞ্জন দাস, মতি-লাল নেহেরু আর একপাশে থাকে মহম্মদ আলি, সৌকত আলী। ফুলের মালা—সে এক-এক গাছা মালা কি? সেই মালার বোঝা হয়ে যায়। বুঝলে। আমরা সব দাঁড়িয়ে থাকি—ভলেণ্টিয়ার।

সরলা নিস্তব্ধ হয়ে শোনে কি কিছু ভাবে—সে সেই জানে। হয় তো দুই-ই করে, শোনেও আবার ভাবেও। স্বপ্নাতুর দৃষ্টিতে দুপুরের নির্জন পথের ওপরে ছায়াভরা বাঁশবনের দিকে চেয়ে থাকে। এদিকে অনর্গল বকে যায় ফণি।

হঠাৎ তাকে বাধা দিয়ে সরলা প্রশ্ন করলে—আচ্ছা ফণি, যাত্রার দলের রাজার পোষাকে—জরির কাজ করা থাকে—মহারাজার পোষাকের কাজ গুলো সোনার তারের নয়? মাথার মুকুটে আসল হীরে থাকে, নয়? আলোর ছটায় পিদীমের মত জ্বলে—নয়?

সরলা পিসীর অজ্ঞতায় ফণি অপরিমেয় কৌতুক অনুভব করল—গভীর স্নেহের সঙ্গে বিজ্ঞভাবে হেসে ব'লে উঠল—আরে না—না—না। গান্ধী মহারাজ রাজপোষাক পরে না। তবে আর গান্ধী মহারাজ কি? নিজে হাতে চরকা কেটে সুতো তৈরী ক'রে—খদ্দর—এই মোটা কাপড় পরে।

তাও বাত সাত। এই হাঁটু পর্য্যন্ত। খালি গা, জামা পরেই না। তা সোনার তার।

বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল সরলা। অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে সে ভাবলে—বুঝতে চেষ্টা করলে ফণির কথা। কিন্তু বুঝতে পারলে না। অবশেষে প্রশ্ন করলে—ক্যানে? হা ফণি—ক্যানে পরে না?

—এই লাও, তবে আর গান্ধী মহারাজ কি! গান্ধী মহারাজ বলে—যতদিন না সবাই ভাল কাপড়-চোপড় পরতে পায়—এই তুমি—আমি মুচি মুদ্দফরাস সবাই—ততদিন রাজপোষাক তিনি পরবেন না। দিন দশ পয়সার বেশী খান না। সবাই যতদিন ভাল খেতে না পাবে ততদিন তিনি ভাল খাবেন না।

সরলা যেন কেমন হয়ে গেল। তার চোখের সামনে দুপুরের নিস্তব্ধ ছায়াঘন বাঁশবন যেন মিলিয়ে গেল—মুছে গেল। মনের মধ্যে সকল জিজ্ঞাসা থেমে গেল। চাল-ধান, পাওনা-গণ্ডার হিসেব ভুলে গেল সে, মাতুমাসীর কুৎসিৎ মুখখানা জীবনে কখনও দেখেছে বলে মনে হ'ল না তার, কোলে মাথা রেখে শুয়েছিল ফণি, যাকে পেয়ে তার জীবন অনেক পাওয়ার আনন্দে ভ'রে উঠেছে—সেই ফণির কথাও সে ভুলে গেল। মাটির পুতুলের মত একদৃষ্টিতে সম্মুখের দিকে চেয়ে সে বসে রইল। সে যেন কাহিনী শুনছে—সে যেন যাত্রাগানের পালা শুনছে।

ফণি ডাকলে—পিসী।

সরলা তখনও বাঁশবনের দিকে চেয়ে অবাক হয়ে রয়েছে।

বৎসর খানেক পরে—ফণির আবার জেল হয়ে গেল।

আশ্চর্য্যের কথা, এবার জেল হ'ল বে-আইনী মদ চোলাই করার অপরাধে। ফণি কিন্তু গান্ধী মহারাজার জয় বলেই চ'লে গেল নির্ভয়ে। মাথার টুপিটা নিতেও ভুললে না।

ছোঁয়াচে রোগ থেকে বাঁচবার জন্যে টিকে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। নানা রোগের নানা টিকে। কিন্তু টিকেরও একটা মেয়াদ আছে। মেয়াদের জোর ফুরিয়ে যায়। ফণি জেলে স্বদেশী বাবুদের কাছে থেকে যে টিকে নিয়ে এসেছিল—তার মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছিল। তাই মাদক নিবারণ করতে গিয়ে সে নিজেই মদ ধ'রে বসল। তখন অসহযোগ আন্দোলনে ভাটা পড়েছে, বাবুরা ইউনিয়ন বোর্ড নিয়ে মেতেছে, বাবুদের ছেলেরা করছে থিয়েটার, ফণির সঙ্গে দেখা হলে কেউ কথা বলে, কেউ বলে না। সে বেকারের মত ঘোরে—এখানে ওখানে বসে বিড়ি টানে—সন্ধ্যায় ফিরে আসে। হাতের পয়সা ফুরিয়েছে—মধ্যে মধ্যে চাকরী খোঁজে—কিন্তু মনের মত পায় না—এক আধটা মিললে—চাকরী যারা দেবে—তারা বলে—"গান্ধী মহারাজার সেপাই তুমি বাবা—তোমাকে চাকরী আমরা দিতে পারি?" কথাটা বলেছিল—ইস্কুলের হেডমাষ্টার; ইস্কুলের চাকরের কাজের জন্য গিয়েছিল ফণি। কলকাতায় যেতে ইচ্ছে হয়—কিন্তু সরলা পিসী বলে—না। সে হবে না। তার চোখ জলে ভ'রে ওঠে। সরলা পিসীকে কাঁদিয়ে যেতে তারও ইচ্ছে হয় না। এমনি অবস্থায় একদিন বাবুদের গাঁ থেকে বাড়ী ফিরবার পথে—সন্ধ্যের মুখে তার দেখা হ'ল বাবুদের গাঁয়ের নিত্য, বুড়ো আর নেপালের সঙ্গে। মাঠের মধ্যে গাছতলায় ব'সে তারা মদ খাচ্ছিল।

ফণি তাদের বললে—ছিঃ। গান্ধী মহারাজার হুকুম শোন নাই তোমরা?

নিত্য বললে—নিশ্চয় শুনেছি।

—তবে?

বুড়ো বললে—বিলিতি কাপড় কিনতে বারণ, কিন্তু দেশী কাপড় পরলে বারণ নাই।

ফণি হকচকিয়ে গেল।

বুড়ো বললে—আছে কি না বল? হ্যাঁ কি না?

—হ্যাঁ দেশী কাপড় পরবে বই কি। নিজে হাতে সুতো কেটে।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ। এও তাই। ইংরাজের মদ আমরা কিনে খাই না। আমরা নিজেরা তৈরী করি নিজের হাতে। গৃহজাত—। স্বদেশী মদ। তাই খাই।

যুক্তি শুনে ফণি অবাক হয়ে গেল। কোন উত্তর সে খুঁজে পেল না। নেপাল নিজের আঙুলটা মদে চুবিয়ে, একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে ধরিয়ে দিলে; আঙুলটার চারদিকে নীলচে আগুন জ্বলতে লাগল। নেপাল বললে—দেখ। কি রকম তেজ দেখ!

বুড়ো বললে—শুঁকে দেখা না গন্ধই আলাদা। কলা দিয়ে তৈরী।

ফণির নাকের কাছে ওরাই ধরলে মদের বোতল। গন্ধ ভাল না লাগলেও—দোকানের মদের গন্ধের মত উৎকট নয়—এটা বলতে হ'ল ফণিকে।

নিত্য বললে—তারও আলাদা—খেয়ে দেখ এক ঢোক।

ফণি সেদিন খেলে না—কিন্তু তিন দিনের দিন খেয়ে অপার আনন্দ অনুভব করলে এবং এই গোপন ব্যবসায়ের প্রসারের কথা শুনে—ওদের সঙ্গে এই অভিনব স্বদেশী ব্যবসায়ে যোগ দিয়েও ফেললে। গাঁয়ের বাবুরা এ ব্যবসায়কে দস্তুরমতো উৎসাহিত করেন। বাঁধা খরিদ্দারই দশ-বারো জন। অর্থাৎ দৈনিক দশ-বারো বোতল বিক্রী—একটাকা বোতল—পাঁচ-ছ' টাকা রোজগার। ফণি হিসেব ক'রে দেখলে—ভাগে দৈনিক সে পাবে পাঁচসিকে দেড়টাকা। 'বন্দেমাতরম্' বলে সে লেগে গেল ওদের সঙ্গে। চলছিলও ভালই। আবগারী বিভাগে স্বরাজ প্রায় এনে ফেলেছিল। হঠাৎ পুলিস ধ'রে ফেললে।

জেল হয়ে গেল এক বছর।

সরলার মনে হ'ল অন্ধকার রাত্রে ঘরের একমাত্র প্রদীপ হঠাৎ নিভে গেল। সত্য সত্যই অতবড় আঘাত সে জীবনে কখনও পায় নি। সংসারের সমস্ত কাজই যেন ফুরিয়ে গেল তার। নিজের পেটের জন্যে আয়োজন করা, সে কি কাজ? নিজের জন্যে ঘর আবার ঘর?

দুপুরবেলা সে তার দাওয়াটিতে বসে থাকে—সেই বাঁশবনটির দিকে চেয়ে। আকাশ-ছোঁয়া হিল-হিলে-লম্বা বাঁশগুলি বাতাসে দোলে—বাতাস জোরালো হয়ে উঠলে বাঁশবনে কত রকম শব্দ ওঠে—কখনও মনে হয় বাঁশীতে কেউ সুর তুলছে; কখনও মনে হয় গরুর গাড়ীর চাকা কাঁদছে; বাঁশবনের তলায় ঝরাপাতা ওড়ে; ডগায় হরিয়াল পাখীরা সারি বেঁধে বসে থাকে, ডাকে—ডাকে যেন জলতরঙ্গ বাজানার সুর বাজে,—কিন্তু সরলার কানেও কিছু যায় না—চোখেও কিছু পড়ে না, সে ভাবে ফণির কথা। তার কোলে মাথা রেখে ফণি গল্প বলত।

গান্ধী মহারাজার গল্প।

এমন রাজার কথা সে আর কখনও শোনে নাই। রাজা রাজভোগ খায় না, রাজবেশ পরে না, রাজপ্রাসাদে বাস করে না; দিন না কি দশ পয়সার খায়, নিজের হাতে-কাটা সুতোয় বোনা সাতহাত কাপড় প'রে কুটীর বেঁধে বাস করে। গরীব-দুঃখী অনাথ-আতুর পেট ভ'রে খেতে পায় না—ছেঁড়া ময়লা কাপড়ের এক দিক পরে এক দিক কাচে, ভাঙা ঘরে জলে ভেজে, শীতে কাঁপে—কতজন পথের ধারে গাছতলায় জীবন কাটায়; তাদের দুঃখের ভাগ নিয়েছে রাজা। তাদের দুঃখ ঘোচাবার জন্যে তপস্যা করছে। পায়ে খড়ম প'রে হাতে দণ্ড নিয়ে রাজা ঘুরছে—অনাথ আতুরের সেবা করবার জন্য।

ভাবতে ভাবতে বেলা প'ড়ে আসে। বাঁশবনের ছায়া ঘন হয়ে ওঠে। দুপুর শেষ হ'তে পাখীরা একবার কল-কল ক'রে ডেকে ওঠে, গাঁয়ের পথে লোক-চলাফেরা সুরু হয়; কাঁধে গামছা ফেলে, কাঁখে কলসী নিয়ে মাতু-মাসী মাঠের 'পাথার' পুকুরের ঘাটে যায়,—সে ঠোঁটের ডগায় পিচ্ কেটে বলে—কি লো—ধ্যান করছিস না কি? কত ঢংই দেখালি!

সরলা এবার চমকে ওঠে। কিন্তু মাতুমাসীর কথার প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে হয় না।

মাতুর পেছনে আসে সরলার বয়সী বউ-ঝিয়েরা। তারা ডাকে—জল আনতে যাবি নাকি সরলা ?

বর্ষার দিনে ঝমঝম ক'রে বৃষ্টি নামে। পাশের বাড়ীতে চেঁচায় ধান তোল—ধান তোল। গেল রে, গেল রে, শুকনো কাপড়খানা ভিজে গেল। তোল তোল।

সরলা ধড়মড় ক'রে ওঠে নিজের ধান কাপড় তুলতে ছুটে যায়।

শীতের দিনে দুপুর গড়ালেই মাঠের কাজ শেষ ক'রে চাষীরা গাঁয়ের পথের ধুলো উড়িয়ে ধান-বোঝাই গাড়ীর সারি নিয়ে গাঁয়ে ঢোকে। গাড়ীর পেছনে ছোটে ছোট ছেলে-মেয়ের দল, ধানের শীষ কুড়োয়—সুযোগ পেলে দু' চার শীষ ছিঁড়েও নেয়, ধানের শীষ বেচে তারা বেগুনী খাবে, পালো খাবে। সরলার দাওয়ার সামনে তারা এসে হাসে। বেশী বয়সী যারা—তারা হাসে মুখ টিপে—ছোটরা হি-হি ক'রে আঙুল দেখিয়ে হাসে। তারাই বলে—সরলা পিসী ধ্যান করছে ভাই। ফণি, ফণি, ফণির ধ্যান করছে। ফণি ওকে 'গুণ' করেছে।

সরলার সম্বিত ফিরে আসে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে উঠে' ঝাঁটা হাতে নিয়ে ঘরের কাজ সুরু করে। অনেক দিন আগে—মাতুমাসীর এই কথা শুনে তার গায়ে যেন জ্বালা ধ'রে গিয়েছিল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—ছেলেগুলোর কথা শুনে তার এতটুকুও রাগ হয় না বরং ওদের কথাই সে মনে মনে সত্যি বলে মেনে নেয়, পরের ছেলে পোষ-না-মানা পাখীর মত শিকলি কেটে উড়ে গেল। কিন্তু শিকলটার যে দিকটা বাঁধা ছিল তার হাতের মণিবন্ধে, শিকলি বজ্র বাঁধনে বেঁধে রাখলো তা'কে। এক এক সময় মনে হয়—ফণি বোধ হয় সত্যিই গোপনে তন্ত্রমন্ত্র প'ড়ে তাকে তুক-তাক কিছু করেছিল। সে নিজেও বুঝতে পারে, আগের মানুষ সে আর নাই। তার সেই আগুনের মত তেজ যেন নিভিয়ে গিয়েছে, তীরের মত কথার তূণ যেন খালি হয়ে গিয়েছে, গোখরা সাপ ছিল সে, এখন ঢোঁড়া

হয়েছে। এক এক সময় মনে হয় সে যেন কাঙাল হয়ে গিয়েছে। কাঙাল ক'রে দিয়ে গিয়েছে ওই ফণি।

স্বামী-পুত্রের সুখ জানে না সরলা, কিন্তু স্বামী-পুত্র নিয়ে যারা ঘর করে তাদের সুখ সে দেখেছে—ফণিকে নিয়ে সে তাদের চেয়েও সুখী হয়েছিল। আগে মধ্যে মধ্যে সরলার আক্ষেপ হ'ত—আঃ, যদি তার মায়ের পেটের একটা ভাইও থাকত। কিন্তু সে কি ফণির মত হ'ত?

ফণি হয় তো তাকে গুণই করেছিল।

এক এক সময় মনে হয়—গান্ধী মহারাজের কাছে সে যদি একবার যেতে পারত, তবে তার চরণ ধ'রে বলত—মহারাজ, তুমি আমার ফণিকে ফিরিয়ে দাও। ওকে বল—যতদিন তোমার পিসী আছে—ততদিন তুমি ঘরে থাক।

সে দিন গুণে যায়—পয়লা—দোসরা—তেসরা, পনেরো বিশে তিরিশে :—বোশেখ গেল, জ্যৈষ্ঠ মাস একত্রিশ দিনে, আষাঢ় আবার বত্রিশ দিনে মাস, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন; ছ' মাস গেল। অঘ্রাণে নবান্ন। পৌষ সংক্রান্তিতে পৌষ লক্ষ্মী—পিঠে পরব; সরলার কিসেরই বা লক্ষ্মী—কার জন্যেই বা পিঠে পরব। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির পুণ্য তার কাছে বড় বলে মনে হ'ল—সে চ'লে গেল গঙ্গাস্নানে। প্রথমে গেল কাটোয়া—সেখান থেকে গেল নবদ্বীপ। গোরাচাঁদ আছেন নবদ্বীপে।

বাকী রইল মাঘ ফাল্গুন চৈত্র। আর মাত্র তিন মাস। দশই চৈত্র দিন রাত্রি সমান, কিন্তু সরলার মনে হ'ল—এত বড় দিন, এত বড় রাত্রি জীবনে সে কখনও দেখে নাই। তিরিশে চৈত্র গাজন। পরদিন বছরের শুভ দিন, বুড়োশিব গাজনের পুজো নিয়ে জলশায়ী হলেন। দোকানে দোকানে হালখাতা। গেরস্ত বাড়ীতে পঞ্চদেবতার পুজো। সরলা অনেক ঘটা ক'রে পুজো দিলে। ফণি ফিরে আসবে।

ফণি খালাস পেয়েছিল ক'দিন আগেই।

বুড়ো, নিত্য এরা এসে খবর দিলে! ওরা খালাস পেয়েছে ক'দিন পরে।

জেলখানায় মাসে তিন দিন রেমিশন পাওয়া যায় ; ফণি পুরো রেমিশন পেয়েছে ; বুড়ো, নিত্য এদের রেমিশন কাটা গিয়েছিল। ফণি সম্ভবতঃ জেল থেকে বেরিয়ে—ওখান থেকেই কলকাতা চলে গিয়েছে। অন্তত তারা বল্লে তাই! সে নাকি বলেছে এবার বেরিয়ে একেবারে কলকাতা। গাঁয়ে লয় বাবা। স্মুদ্দেরেতে ডুব মারব। ডোবায় থাকলে—দড়ি বেঁধে পুলিশে 'দিগদড়ি' (দীর্ঘ দড়ি) দিয়ে বেঁধে রাখবে। কোথাও কিছু হ'লেই টানবে। তা ছাড়া—কিসের সুখে গাঁয়ে থাকব ?

সুখের সন্ধানে সে কলকাতা গিয়েছে। নিশ্চয়ই গিয়েছে। নির্ঘাৎ। বুড়ো ব'লে দাঁত মেলে হাসতে লাগলো।

সরলার ঠোঁট কাঁপতে লাগলো। প্রাণপণে সে বুক বাঁধতে চেষ্টা করলে—কিন্তু বানের মুখে বালির বাঁধের মত সে থাকল না।

লোকে বললে—সরলার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। কথা নাই, বার্তা নাই, হাসি নাই, কান্না নাই, ভাল নাই, মন্দ নাই—মাথা খারাপ না হ'লে মানুষ এমনি হয় ?

মাতুমাসী বললে—সরলা তুই গুণীন দেখা! কোন তুকতাক সে ক'রে গিয়েছে।

সরলা তার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তারও মনে হ'ল—তা হবে। সত্যিই তো নইলে এমন হবে কেন ?

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে সে।

নীরব স্তব্ধ আনন্দহীন দুঃখহীন সরলা কাজ-কর্ম করে, ধান আনে, ধান ভানে, দুপুরে দাওয়ায় বসে থাকে বাঁশবনের দিকে চেয়ে।

মাঝে মাঝে চমক আসে।

বন্দেমাতরম্! মহাত্মা গান্ধী কি জয়! শব্দ শুনে নিথর জীবনে তার তরঙ্গ ওঠে।

দেশজুড়ে আবার রব উঠল! তেরশো সাঁইত্রিশ সাল!

নদীর বন্যা পুকুরের গায়ে এসে লাগে। এপারে জল ওপারে জল—মধ্যখানে থাকে পুকুরের মোহনায় মাটির বাঁধ। কতকালের পুরণো বাঁধ—জমে' পাথরের চেয়েও শক্ত হয়ে গিয়েছে, জলে গলে না; বানের জল ঢেউ মারে; এপারে পুকুরের জলের মাছের আর তর সয় না বাঁধ ভাঙার—তারা লাফ মারে; এপার থেকে ওপার।

তেমনি ক'রে মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে লাফ দিয়ে পড়ছে।

মহারাজার ডাক এসেছে। সে ডাক ওই বানের জলের মত।

সরলার অসাড় মনে 'সাড়' এসেছে। সে নিত্য এসে ব'সে থাকে—ইষ্টিশানের ধারে। ব'সে ব'সে দেখে। বর্ষায় বানের জলে 'পাউষের' মাছের মত লম্বা সারি দিয়ে চলেছে সব ধ্বজা পতাকা নিয়ে।

ফণি? ফণি কোথায়?

আবার থিতিয়ে আসে, থেমে আসে হাঁক ডাক।

সরলা দাওয়ায় ব'সে থাকে বাঁশবনের দিকে চেয়ে।

আবার চমক আসে।

গান গেয়ে ভিক্ষে করছে বাবুদের ছেলেরা। বলে, হরিজন-আন্দোলন। সে কি? মহাত্মা গান্ধী গরীব লোকদের জন্যে ভিক্ষে চেয়েছেন।

ভিক্ষে? মহারাজ ভিক্ষে করছেন?

সরলা পরদিন একটি টাকা আঁচলে বেঁধে নিয়ে এল। দেবে সে, এক টাকাই দেবে। ষোল আনার কম কি দেওয়া যায়! কিন্তু ভিক্ষের দল সামনে দিয়েই পার হয়ে গেল, সে টাকাটা মুঠোয় চেপে দাঁড়িয়ে রইল। বাড়ী ফিরে টাকাটায় সিঁদুর মাখিয়ে তুলে রাখলে।

তেরশো বাহান্ন সাল।

সরলা নিজে আছে আর সব তার মুছে গিয়েছে। উনপঞ্চাশের ঝড়ে ঘর উড়েছে, বানে দেওয়াল পড়েছে; পঞ্চাশের 'আকাড়া'য় (দুর্ভিক্ষে) সে ভিক্ষে

সার করেছে, রোগে অস্থিচর্মসার হয়েছে। পরণে তার শতচ্ছিন্ন একখানা রেশমের কাঁটের কাপড়। সব গিয়ে ওইখানাই তার সম্বল। ওখানা ধর্ম-কর্ম করার জন্য শুদ্ধ কাপড় ছিল। এখন পথের ধারে ব'সে ভিক্ষে করে।

ফণিকে মনে পড়ে না, মনের মধ্যে শুধু দুটি কথা—একটি পয়সা। আর কি ক'রে তার মরণ হবে! সঙ্গী জুটেছে একজন। একটি ছোট মেয়ে। নিজের নাম পর্য্যন্ত জানে না। নাম বলে—খুকু।

ভাল নাম কি? ভাল নাম তো আছে একটা?

অনেক ভেবে মেয়েটা বলে—খুকুরাণী।

সরলার হাত ধ'রে সে পথে বসিয়ে দেয়। আবার উঠিয়ে নিয়ে আসে।

সরলা বসেছিল পথের ধারে। মেয়েটা এসে বললে—উঠে আয় আজ।

—এর মধ্যে উঠব কি লা?

—না উঠলে মরবি। পায়ে চেপে মেরে দেবে নোকে।

—ক্যানে?

—মহাত্মা গান্ধী আসবে আজ হেথাকে! এই পথে যাবে। নোক ভাঙছে, ইষ্টিশান ভবে গিয়েছে দেখে এলাম।

চমক এল! মজে যাওয়া ডোবায় পাঁকাল জল এতটুকু—সেই জলে যেন ঘুর্ণী ঝড় এসে লাগল। তার ঘোলা চোখ দুটো বড় হয়ে উঠল। চোখের পাতায় ঢাকা থাকে যে অংশটা—তার সাদা রঙে রোদের ছটা লেগে ঝিক্-মিক্ ক'রে উঠল।

—মহারাজ গান্ধী? মহারাজা?

—হ্যাঁ। মিটিং হবে। এই এত টাকা দেবে নোকেরা। তোকে আজ ভিখ দেবে না কেউ। উঠে আয়। সরলার মনে পড়ল—একটা সিঁদুর মাখা টাকার কথা। কবে, কবে, কবে সে টাকা সে খেয়ে ব'সে আছে।

—উঠে আয়!

সরলা তাকালে তার শুদ্ধ কাপড়খানার দিকে। শুদ্ধ কাপড় আর নাই।

ছেঁড়া তেনা। তবু সে উঠল—চলল। খুকী ডাকলে। সে ডাক সে শুনতে পেলে না। খুকী বললে— মরগা তবে তু—মরগা'—যা।

ধুলো উড়ছে। কাতারে কাতারে মানুষ আসছে। ধ্বনি উঠছে। জনসমুদ্রে কল্লোল উঠল। জোয়ার আসছে। খুকী বুড়ীকে আর দেখতে পেলে না। ডুবে গেল বোধ হয় মানুষের সমুদ্রে।

কর্মী জগদানন্দ খবরের কাগজে রিপোর্ট পাঠাচ্ছিল।

"পথের দুইধারে সমবেত জনতার মধ্যে এক বৃদ্ধা ভিখারিণী দাঁড়াইয়াছিল। মহাত্মাজী যখন গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া মণ্ডপাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন এক অভূতপূর্ব কাণ্ড ঘটিল। বৃদ্ধা ভিখারিণী কম্পিত হস্ত মহাত্মাজীর দিকে প্রসারিত করিয়া ধরিল: দেখা গেল সে তাহার ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। ভিক্ষা চাহিবার জন্য নয়। ভিক্ষা-পাত্রটি সে তাঁহার পদপ্রান্তে নামাইয়া দিল। ভিক্ষাপাত্রে ছিল কয়েকটি পয়সা ও ডবল পয়সা। মহাত্মাজী দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধার মুখের দিকে একবার চাহিলেন। তাঁহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। তিনি ভিক্ষা-পাত্র হইতে একটি পয়সা তুলিয়া লইয়া বৃদ্ধার মাথায় হাত রাখিলেন।

আমরা খোঁজ করিয়া ভিখারিণীকে আর পাই নাই।"

—শেষ—